POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

## আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা (তোমাদের) অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর।

(সূরা মায়েদা, আয়াত: ২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 16

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

22 এপ্রিল, 2021 ● 9 রমযান 1442 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

## রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১২১৬) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমি নবী (সা.) কে তিনি নামায রত অবস্থায় সালাম করতাম আর তিনি তার উত্তর দিতেন। আমরা যখন (ইথিওপিয়া হিজরত থেকে ) ফিরে এলাম, তখন অমি তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। (পরে) তিনি বললেন- নামাযে এক প্রকার ব্যস্ততা থাকে।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর কোন কাজে আমাকে প্রেরণ করেন। আমি সেই কাজ শেষ করে ফিরে আসি। আমি নবী (সা.) এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না। আমার মনে যে ধারণার উদ্রেক হল তা আল্লাহ্‌ই উত্তম জানেন। আমি মনে মনে বললাম, আমি দেরি করে ফেলেছি, তাই হয়তো তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। এরপর আমি পুনরায় সালাম করলাম। তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না। আমার মনে আগের বারের থেকে বেশি আঘাত লাগল। আমি পুনরায় সালাম করলে তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি নামায পড়ছিলাম, যা আমাকে উত্তর দিতে বাধা দিচ্ছিল।

ব্যাখ্যা: হযরত সৈয়্যদ জায়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব বলেন: কিছু কিছু ফিকাহবিদের নিকট মুখে 'আসসালামো আলাইকুম' উচ্চারণ না করে দোয়া হিসেবে মনে মনে সালামের উত্তর দিয়ে দেওয়া উচিত কিম্বা ইঙ্গিতে উত্তর দেওয়া উচিত। ইমাম বুখারী এই মতকে পূর্ণত খণ্ডন করেছেন। রেওয়াত নম্বর ১২১৬, ১২১৭ থেকে প্রকাশিত যে আঁ হযরত (সা.) নামায শেষ করে সালামের উত্তর দিয়েছেন। জমহুরেরও এই একই অবস্থান।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড)

### এই সংখ্যায়

**খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২১**
**খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১২ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১**

**আমি কোন্ পন্থা অবলম্বন করব যাতে আমার জামাত সত্যিকারের তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জন করে- এই নিয়ে আমার হৃদয়ে প্রবল বেদনা সৃষ্টি হয়।**

## হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বার্তা

অবশ্যই মনে রেখো! খোদা তাঁর বান্দাকে কখনও বিনষ্ট করবেন না; তিনি তাকে ততদিন মৃত্যু দিবেন না যতদিন পর্যন্ত না তার হাতে সেই দুটি কাজ পূর্ণতা পায় যার জন্য তার আগমণ হয়েছে। কারো সঙ্গে কোন বিবাদ বা কারো কোন অভিশাপ তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

এই বিষয়টির প্রণোদনা এভাবে হয়েছে যে, কেউ বলল, এখন বিরুদ্ধবাদী মুলহিম সাহেব বলেন, এই জামাতের ধ্বংসের সময় এখন ঘনিয়ে এসেছে। كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا । অতঃপর তিনি (আ.) অত্যন্ত বেদনাতুর হৃদয়ে বলেছেন-

কাল (২২ শে জুন, ১৮৯৯) অনেকবার খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছে, এই মর্মে যে, তোমরা যদি মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথে চল তবে খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমি কোন্ পন্থা অবলম্বন করব যাতে আমার জামাত সত্যিকারের তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জন করে- এই নিয়ে আমার হৃদয়ে প্রবল বেদনা সৃষ্টি হয়। আমি অনেক দোয়া করি, এতটাই যে দোয়া করতে করতে দুর্বলতা ছেয়ে যায়, অনেক সময় মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়, প্রাণ সংশয় পর্যন্ত দেখা দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জামাত খোদার দৃষ্টিতে মুত্তাকি হিসেবে গণ্য না হয়, ততক্ষণ তারা খোদার সাহায্য লাভ করতে পারে না। তওরাত ও ইঞ্জিল সহ সকল ঐশী গ্রন্থের শিক্ষার সারমর্মই হল তাকওয়া। কুরআন করীম একটি মাত্র শব্দ দ্বারা খোদা তা'লার এই মহা অভিপ্রায় ও ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে। তাছাড়া জামাতের সত্যিকার মুত্তাকি, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানকারী এবং খোদার পথে জগত থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারীদের পৃথক করে তাদেরকে কিছু ধর্মীয় কাজ সোপর্দ করার ভাবনাও আমার আছে। অতঃপর জগতের মোহে নিমজ্জিত এবং দিবারাত্রি জড় জগতের সন্ধানে ব্রতীদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করব না।

আহ! এখন তো খোদা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আপন পর সকলেই আমাকে অপদস্ত করতে উদ্যত। দিবারাত্রি আমার বিপদাপদের অপেক্ষায় বসে আছে। এখন যদি খোদা আমর সাহায্য না করেন তবে কোথায় ঠাঁই পাই? (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৭৬)

**সম্মান রক্ষা করা উচ্চ মর্যাদার কাজ। তথাপি একথা দৃষ্টি রেখে যে, তবলীগের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি হবেনা বা জাতি পর্যায়ের কিম্বা শরীয় বিধান অথবা ধর্মীয় কোন কাজের উদ্দেশ্যে এমন কোন কাজের স্বার্থে কোন ব্যক্তি যদি নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে দেয় এবং তার উপর থাকা অভিযোগ নিয়ে চিন্তিত হয় না- নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, যে কিনা, সদুদ্দেশ্যে হলেও, নিজের সম্মান রক্ষার দাবি করে।**

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ বলেন: হযরত ইউসুফ (আ.) কে যখন বাদশাহ ডেকে পাঠালেন, তখন তাঁর নিকট দুটি পথই খোলা ছিল। হয় তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসতেন, নচেত প্রথমে নিজেকে অভিযোগমুক্ত করে বের হতেন। এই দুটি কাজ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হলেও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি কাজই পুণ্যকর্মে পর্যবসিত হত অথবা দুটিই মন্দকর্মে। কারণ হযরত ইউসুফ (আ.) যদি অহংকার ও দাম্ভিকতার বশে এমনটি করতেন, তিনি যদি বলতেন, প্রথমে নিজের দোষ স্বীকার করুন তবেই আমি বের হব-তবে এটি পাপ হত। অনুরূপভাবে যদি এই পন্থা অবলম্বন করতেন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য কোন ধর্মীয় উপযোগীতা দৃষ্টিতে না রেখেই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসতেন, তবে সেটিও পাপ হত। কিন্তু তিনি বের হতে অস্বীকার করেন নি। তিনি বের হতে অসম্মতি জানান, এজন্য নয় যে তিনি অহংকারী ছিলেন, বরং যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন, কেবল এজন্য যে তাঁর এক উপকারী বন্ধু পাছে এই সংশয়ে নিপতিত হয় যে ইউসুফ (আ.) তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই অসামান্য প্রক্ষোভের কারণে তাঁর এই কার্জটি উৎকৃষ্ট মানের পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু চতুর্থ একটি দৃষ্টিভঙ্গিও আছে যার কারণে তাঁর ততক্ষণাত বেরিয়ে আসা পুণ্যকর্ম হিসেবে গণ্য হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি রসুলুল্লাহ (সা.) অবলম্বন করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি হল নিজের উপর ন্যস্ত নবুয়্যতের গুরু দায়িত্ব পালনের চিন্তা। একজন নবী কিম্বা শিক্ষক খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তার সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়াই কর্তব্য। এমনকি যদি সম্মান এবং খ্যাতিও বিসর্জন দিতে হয়, তবু কোন পরোয়া করেন না। একজন নবী যদি কয়েদখানায় বন্দী থাকেন,তবে সেক্ষেত্রে হয় তিনি তবলীগ করতে পারবেন না, কিম্বা তা সীমিত আকারে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নিজের স্বাধীনতার বিষয়ে ভাবিত হওয়া তার অনেক বড় ত্যাগস্বীকার হবে যদি সে নিজেকে দোষমুক্ত হিসেবে প্রমাণ না করে করে বন্দীত্ব থেকে বেরিয়ে আসে আর

*( শেষাংশ শেষের পাতায়..)*

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# জুমআর খুতবা

## হযরত উসমান (রা.) বলেন: কোন উম্মত নেতা ব্যতিরেকে উন্নতি করতে পারে না। আর কোন ইমাম যদি না থাকে তাহলে জামা'তের সকল কাজ বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

## আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ, যুন নুরাইন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

## হযরত আলী (রা.)কে ওয়াসী আখ্যাদাতা এই গোষ্ঠি সত্যের সমর্থন কিংবা আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার দরুন নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হয় নি, বরং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এসেছে।

## চারজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব, যারা হলেন-মুকাররম মৌলবী মহম্মদ নাজীব খান সাহেব (নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, দক্ষিন ভারত) ,মুকাররম নাযীর আহমদ খাদিম সাহেব, আল হাজ ডক্টর নানা মুস্তফা উটি বোয়াটং (ঘানা) এবং মুকাররম গোলাম নবী সাহেব (রাবোয়া)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৫ই ফেব্রুয়ারী,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা ৫ আমান, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে যে নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা চলছিল। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যা কিছু বর্ণনা করেছেন (তা উপস্থাপিত হচ্ছিল)। এ সম্পর্কে তিনি অধিকাংশ কথা তবারীর উদ্ধৃতিমূলে উপস্থাপন করেছেন বা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচারবিশ্লেষণও উপস্থাপন করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, এই তিনজন, অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন আবু বকর, মুহাম্মদ বিন হুযায়ফা এবং আম্মার বিন ইয়াসের বিদ্রোহীদের কথায় সায় দিয়ে তাদের সাথে যোগ দেয়। তিনি বলেন, এদের ছাড়া মদীনার অন্য কোন ব্যক্তি, সাহাবী হোন বা অন্য কেউ হোক; সেসব নৈরাজ্যবাদীর প্রতি কোন সহানুভূতি রাখত না আর প্রত্যেকেই তাদেরকে প্রবল তিরস্কার ও অভিসম্পাত করত। কিন্তু তাদের হাতে তখন ব্যবস্থাপনা ছিল না। এরা (অর্থাৎ বিদ্রোহীরা) কারো তিরস্কারের তোয়াক্কা করত না। ২০ দিন পর্যন্ত তারা শুধু মৌখিকভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যায়। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা (চাইত) কোনভাবে হযরত যেন উসমান (রা.) খিলাফত ছেড়ে দেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) এটি করতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, খোদা তা'লা আমাকে যে জামা পরিয়েছেন তা আমি খুলতে পারি না। যে যেভাবে চাইবে সেভাবে অন্যের প্রতি অন্যায়-অবিচার করবে- উম্মতে মুহাম্মদীয়াকেও আমি এমন অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না । বিদ্রোহীদেরও তিনি বুঝাতে থাকেন যে, এ নৈরাজ্য হতে বিরত হও। তিনি বলেন, এসব লোক আজ নৈরাজ্য করে যাচ্ছে আর আমার জীবনের প্রতি তাদের অনিহা, কিন্তু যখন আমি থাকব না তখন তারা আকাঙ্খা করে বলবে, হায়! যদি উসমানের জীবনের এক একটি দিন বছরে রূপান্তরিত হতো আর তিনি আমাদের ছেড়ে না যেতেন। কেননা আমার পর ভয়ঙ্কর রক্তপাত হবে এবং অধিকার হরণ করা হবে আর ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়বে। যেমন বনু উমাইয়্যার যুগে খিলাফত রাজতন্ত্রে বদলে গেছে এবং সেই নৈরাজ্যবাদীরা এমন শাস্তি পায় যে, সকল দুস্কৃতি তারা ভুলে যায়।

যাহোক, ২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এসব বিরুদ্ধবাদী বিদ্রোহীরা ভাবল, শিঘ্রই কোন সিদ্ধান্ত করতে হবে , পাছে প্রাদেশিক সৈন্য বাহিনী এসে পড়ে আর আমাদেরকে আমাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করতে হয়। তারা জানত যে, তারা ভুল (পথে রয়েছে) এবং মুসলমানদের অধিকাংশই হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে। এজন্য তারা হযরত উসমান (রা.) কে গৃহবন্ধী করে দেয় এবং ভেতরে খাদ্য-রসদের জোগানও বন্ধ করে দেয়। তারা মনে করে, হয়তো এভাবে বাধ্য হয়ে হযরত উসমান (রা.) আমাদের দাবি মেনে নিবেন। কিন্তু তিনি (রা.) বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে জামা পরিয়েছেন তা আমি কীভাবে খুলতে পারি? যাহোক, মদীনার ব্যবস্থাপনা ছিল সেই লোকদের হাতে আর তারা মিলে মিশরীয় বিদ্রোহীদের সর্দার গাফেকীকে নিজেদের নেতা বানিয়ে নিয়েছিল। এভাবে গাফেকী-ই যেন তখন মদীনার শাসক ছিল । কুফার (বিদ্রোহী সৈন্য বাহিনীর নেতা ছিল আশ্তার এবং বাসরার সৈন্য দলের প্রধান ছিল হাকীম বিন জাবালা, অর্থাৎ সেই ডাকাত যাকে হযরত উসমান (রা.) জিম্মীদের সম্পদ লুটপাটের কারণে বাসরাতে নজর বন্দি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই ডাকাতই নেতা হয়ে গিয়েছিল। হাকীম বিন জাবালা এবং আশ্তার উভয়েই গাফেকীর অধিনে কাজ করত। তিনি (রা.) বলেন, এ থেকে পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, এই নৈরাজ্যের মূল হোতা ছিল মিশরীয়রা, যেখানে আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা কাজ করছিল।

মসজিদে নববীতে গাফেকী নামায পড়াত আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা নিজেদের গৃহে বন্দি অবস্থায় থাকতেন অথবা তার পিছনে নামায পড়তে বাধ্য হতেন। হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি অবরোধের সিদ্ধান্ত করার পূর্ব পর্যন্ত এসব লোক মানুষের ওপর তেমন একটা চড়াও হতো না। কিন্তু অবরোধ করতেই তারা অর্থাৎ বিদ্রোহীরা অন্যদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। আর মদীনা তখন শান্তিধাম নয় বরং রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তখন মদীনাবাসীর মানসম্মান বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, কেউই অস্ত্র ছাড়া ঘর থেকে বের হতো না। যারা মোকাবিলা করত তাদেরকে তারা হত্যা করত। এরা যখন হযরত উসমান (রা.)কে অবরুদ্ধ করে এবং (গৃহের) ভেতরে পানিটুকু যাওয়াও বন্ধ করে দেয় তখন হযরত উসমান (রা.) তাঁর এক প্রতিবেশীর ছেলেকে হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.)-এর নিকট (এ সংবাদ দিয়ে) প্রেরণ করেন যে, এরা আমাদের পানি বন্ধ করে দিয়েছে, এখন আপনারা যদি কিছু করতে পারেন তাহলে চেষ্টা করুন এবং আমাদের জন্য পানি পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.) আসেন। তিনি তাদেরকে বুঝাতে গিয়ে বলেন, তোমরা এ কি আচরণ প্রদর্শন করছ? তোমাদের ব্যবহার মু'মিনদের আচরণের সাথেও সামঞ্জস্য রাখে না আর কাফেরদের সাথেও না। হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়িতে পানাহারের সামগ্রী যেতে বাধা দিও না। হযরত আলী (রা.) বলেন, রোম এবং পারস্যের লোকেরাও যদি বন্দী করে তাহলে অন্তপক্ষে (তারাও বন্দীদের) খাবার খাওয়ায় এবং পানি পান করায়। আর ইসলামী রীতি অনুযায়ী তো তোমাদের এই কর্ম কোনভাবেই বৈধ নয়। হযরত উসমান (রা.) তোমাদের এমন কী ক্ষতি করেছেন যে, তোমরা তাকে বন্দী করা ও হত্যা করাকে বৈধ জ্ঞান করছ? হযরত আলী (রা.)-এর এই উপদেশের তাদের ওপর কোন প্রভাব পড়ে নি। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, যাই হোক না কেন আমরা এই ব্যক্তির কাছে দানাপানি পৌঁছতে দিব না। এটি ছিল সেই উত্তর যা তারা সেই ব্যক্তিকে দিয়েছে যাকে তারা মহানবী (সা.) -এর ওসী বা তাঁর সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত আখ্যা দিত। হযরত আলী (রা.) সম্পর্কেই তারা বলত, তিনি সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত, (অথচ) তাকেই এই উত্তর শুনতে হচ্ছে। এই উত্তরের পর এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য কি আর কোন সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন আছে যে হযরত আলী (রা.)কে ওয়াসী আখ্যাদাতা এই গোষ্ঠি সত্যের সমর্থন কিংবা আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার দরুন নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হয় নি, বরং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এসেছে।

উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মধ্য থেকে সবার আগে হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তিনি একটি খচ্চরে আরোহিত ছিলেন আর নিজের সাথে এক মশ্ক পানিও এনেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, বনু উমাইয়্যার এতিম এবং বিধবাদের ওসীয়্যত বা আমানত যা হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে গচ্ছিত ছিল। তিনি (রা.) যখন দেখলেন, বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.)-এর পানি বন্ধ করে দিয়েছে তখন তাঁর শঙ্কা হলো, কোথাও আবার সেই ওসীয়্যত ও আমানত না নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই তিনি চাইলেন যে, কোনভাবে যেন সেই ওসীয়্যতগুলো সংরক্ষণ করা যায়। অন্যথায় অন্য কোন উপায়েও তিনি (রা.) পানি পৌঁছে দিতে পারতেন। তিনি (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর দরজায় গিয়ে পৌঁছলে বিদ্রোহীরা তাকে বাধা দিতে যায়।

তখন লোকেরা বলল, ইনি উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা.)। কিন্তু এতেও তারা বিরত হয় নি বরং তাঁর খচ্চরকে আঘাত করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা.) সেই বিদ্রোহীদের বলেন, আমার আশংকা হয় যে কোথাও বনু উমাইয়্যার এতিম ও বিধবাদের ওসীয়্যত বা আমানতগুলো নষ্ট না হয়ে যায়। আমি ভেতরে যেতে চাই যাতে সেগুলোর সুরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু সেই দুর্ভাগারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীকে প্রত্যুত্তরে বলল, আপনি মিথ্যা বলছেন। (এ কথা বলেই) তাঁর খচ্চরের ওপর হামলা করে সেটির পালানের রশি কেটে দেয়, ফলে জিন উল্টে যায় আর হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)এর নিচে পড়ে যান, এমনকি সেই নৈরাজ্যবাদীদের পদপিষ্ট হয়ে শহীদ হওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু পাশে থাকা মদীনাবাসীরা তাকে তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলেন এবং বাড়িতে পৌঁছে দেন।

এরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীর সাথে এমন আচরণই করেছে। মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) এর অসামান্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল। পনেরো ষোল বছরের বিচ্ছেদের পরও যখন তাঁর পিতা একটি বিশেষ রাজনৈতিক মিশন নিয়ে মদীনায় আসে, যে কিনা আরবের সর্দার ছিল এবং মক্কায় একজন রাজার মর্যাদা রাখতো; সে যখন এবং উম্মে হাবীবা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়, তখন বসতে গেলে তিনি (রা.) তার নিচে থেকে মহানবী (সা.)-এর বিছানা সরিয়ে নেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বিছানা বিছানো ছিল। তাঁর পিতা যখন বসতে গেলো তিনি এজন্য বিছানা সরিয়ে নেন যে, খোদার রসূলের পবিত্র কাপড় একজন মুশরিকের অপবিত্র দেহ স্পর্শ করবে, তা দেখা তাঁর জন্য অসহনীয় ছিল। তাই পিতাকেও বসতে দেন নি। বিস্ময়ের বিষয় হলো হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবর্তমানে তাঁর কাপড়ের পবিত্রতার বিষয়েও সচেতন ছিলেন, কিন্তু এসব নৈরাজ্যবাদী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবর্তমানে তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীর সম্মানের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে নি। অজ্ঞের দল বলেছে, মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী মিথ্যাবাদী, অথচ তিনি যা কিছু বলেছিলেন তা সঠিক ছিল।

হযরত উসমান (রা.) বনু উমাইয়্যার এতিমদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। (অপর দিকে) তাদের ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করে উম্মে হাবিবা (রা.)'-র আশংকা সঠিক ছিল যে, এতিম ও বিধবাদের সম্পদ কোথাও আবার নষ্ট না হয়ে যায়। মিথ্যাবাদী ছিল তারা যারা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসার দাবি করে তাঁর ধর্মকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল , কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা.) মিথ্যাবাদী ছিলেন না। হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর সাথে যে আচরণ করা হয়েছিল সেই সংবাদ মদীনায় ছড়িয়ে পড়লে সাহাবীগণ ও মদীনাবাসী বিস্মিত হয়ে যায় আর তারা নিশ্চিত হয়ে যান যে, এদের পক্ষ থেকে এখন আর কোন মঙ্গালের আশা করা দুরাশা। হযরত আয়েশা (রা.) তৎক্ষণাৎ হজ্জের সংকল্প করেন এবং সফরের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। লোকেরা যখন জানতে পারে যে তিনি (রা.) মদীনা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে নিবেদন করেন, আপনি যদি এখানেই অবস্থান করেন তাহলে হয়তো বা বিশৃঙ্খলা থামার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে আর বিদ্রোহীদের ওপর কিছুটা হলেও প্রভাব পড়বে। কিন্তু তিনি (রা.) অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, তোমরা কি চাও আমার সাথেও সেই আচরণ হোক যা উম্মে হাবীবার সাথে হয়েছে? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার সম্মানকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। কেননা এটি ছিল মহানবী (সা.)-এর সম্মান। আমার সাথে যদি কোন (অসম্মানজনক) কিছু করা হয় তাহলে আমার নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা হবে? এসব লোক তাদের দুষ্কৃতির ক্ষেত্রে কতটা সীমালঙ্ঘন করবে আর তাদের পরিণামই বা কী হবে তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হজ্জে যাওয়ার সময় এমন একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন; তা যদি কার্যকর হতো তাহলে হয়তো এই নৈরাজ্যের মাত্রা কিছুটা স্তিমিত হত। সেই কৌশলটি ছিল, তাঁর ভাই মুহাম্মদ বিন আবু বকর যে তার অজ্ঞতার কারণে বা কমবয়স্ক হওয়ার কারণে কিংবা দুর্বল ঈমানের দরুন বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করছিল, তিনি তাকে এই বলে ডেকে পাঠান যে, তুমিও আমার সাথে হজ্জে চল, কিন্তু সে হজ্জে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। এটি শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কী করব! আমি তো নিরুপায়! আমার সামর্থ থাকলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রকে কখনো সফল হতে দিতাম না। হযরত আয়েশা (রা.) হজ্জে চলে যান এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল এবং যারা মদীনা থেকে বের হতে পারতেন তারাও মদিনা ছেড়ে চলে যান। এছাড়া গুটিকতক জ্যেষ্ঠ সাহাবী ব্যতীত অন্য লোকেরা নিজেদের ঘরেই অবস্থান করে। অবশেষে হযরত উসমান (রা.)ও এটি অনুধাবন করতে পারেন যে, এরা সহজে মানার পাত্র না। তাই তিনি (রা.) বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নরদের নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন। যার সারাংশ হলো-হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর পর কোন আকাঙ্খা বা আবেদন ছাড়াই আমাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাদের ওপর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে পরমার্শ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) যে পত্রটি লিখেছিলেন তাতে এসব কথা লিখেছিলেন। পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, এরপর আমার কোন বাসনা বা যাচনা ছাড়াই আমাকে খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয় আর আমি ঠিক সেসব কাজই করতে থাকি যেগুলো পূর্ববর্তী খলীফারা করেছেন। অধিকন্তু আমি কোন বিদা'ত বা কুসংস্কারের জন্ম দিই নি, কিন্তু কিছু লোকের হৃদয়ে অনিষ্টের বীজ বপিত হয়েছে এবং দুষ্কৃতি স্থান করে নিয়েছে আর তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা আরম্ভ করে এবং মানুষের সামনে এক প্রকার কথা বলে আর হৃদয়ে ভিন্ন কথা লালন করে। আর আমার ওপর সেসব দোষ আরোপ করা আরম্ভ করে যেগুলো আমার পূর্বের খলীফাদের প্রতিও আরোপ করা হতো। কিন্তু আমি (সব) জেনেও নীরব থাকি। তারা আমার দয়ামায়ার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে দুষ্টামির ক্ষেত্রে আরো সীমা ছাড়িয়ে যায়। অবশেষে কাফেরদের ন্যায় মদিনায় আক্রমণ করে বসে। অতএব আজ লোকেরা যদি কিছু করতে পারে তাহলে তারা যেন সাহায্যের ব্যবস্থা করে।

অনুরূপভাবে একটি পত্র, যা হজ্জে আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে লিখে কিছুদিন পর তিনি প্রেরণ করেন, অর্থাৎ মক্কায় হাজীদের উদ্দেশ্যে যেটি তিনি প্রেরণ করেন, তার সার কথা হলো, আমি খোদা তা'লার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আর তাঁর পুরস্কাররাজি স্মরণ করাচ্ছি। এখন কতিপয় লোক নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে আর ইসলামে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় রত আছে, কিন্তু তারা এতটুকুও চিন্তা করে নি যে, খলীফা খোদা নিযুক্ত করেন। যেমনটি তিনি বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে ঈমান আনয়নকারী এবং যথোচিত আমলকারীদের আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন। (সূরা নূর: ৫৬) তিনি বলেন, তারা একতাকে গুরুত্ব দেয় না, অথচ আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا । অর্থাৎ তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'লার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

অতঃপর তিনি বলেন, আর আমাকে দোষারোপকারীদের কথা গ্রহণ করে এবং পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশের পরোয়া করে না যে, يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমাদের কাছে কেউ যদি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আসে, অর্থাৎ কোন নৈরাজ্যবাদী যদি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তা যাচাই করে নাও। (সূরা হুজুরাত: ০৭)

এরপর তিনি বলেন, এরা আমার বয়আতের মর্যাদা দেয় নি, অথচ আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলেছেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ - অর্থাৎ যারা তোমার বয়আত করে তারা কেবল আল্লাহ্‌র বয়আত করে। (সূরা ফাতাহ্: ১১) তিনি বলেন, আর আমি মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ এই নির্দেশ আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কেননা আমি মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত। কোন উম্মত নেতা ব্যতিরেকে উন্নতি করতে পারে না। আর কোন ইমাম যদি না থাকে তাহলে জামা'তের সকল কাজ বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর তিনি বলেন, তারা মুসলিম উম্মতকে নষ্ট ও ধ্বংস করতে চায় এবং এ ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি তাদের কথা মেনে নিয়েছিলাম এবং শাসকদের পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু এরপরও তারা দুষ্কৃতি পরিত্যাগ করে নি। এখন তারা তিনটি কথার মধ্য থেকে একটির দাবি করে। অর্থাৎ বিদ্রোহীরা তিনটি দাবি উত্থাপন করেছিল। প্রথমত- যারা আমার খিলাফতকালে শাস্তি পেয়েছে আমি যেন তাদের সবার রক্তপণ বা বিনিময় প্রদান করি। এটি যদি না মানি তাহলে আমি যেন খিলাফতের আসন ছেড়ে দিই। অর্থাৎ যাদেরকে শাস্তি দিয়েছি তাদের রক্তপণ যদি আমি না দিই, তাহলে যেন আমি খিলাফতের আসন ছেড়ে দিই এবং তারা আমার স্থলে অন্য কাউকে নির্ধারণ করবে। আর এই প্রস্তাবও যদি আমি না মানি, তাহলে তারা হুমকি দেয় যে, তারা তাদের সমমনা সবাইকে এই বার্তা প্রেরণ করবে যে, তারা যেন আমার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রথম কথার উত্তর হলো, আমার পূর্বের খলীফারাও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কখনো ভুল করলে তাদেরকে কখনো শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় নি। যদি কোন ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য কোন রক্তপণ পূর্বের খলীফাগণ দেন নি আর (এর জন্য) কোন প্রকার শাস্তিও পান নি। আমিও তদ্রুপই করেছি। তাই আমার জন্য এরূপ শাস্তির ঘোষণা করার অর্থ আমাকে হত্যা করা ছাড়া আর কী হতে পারে! অর্থাৎ, যেসব কথা তোমরা বলছ যে, রক্তপণ দাও নতুবা শাস্তি গ্রহণ কর- এর অর্থ কেবল এটি -ই যে, তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও। এরপর তিনি বলেন, খিলাফতের আসন থেকে অপসারিত হওয়া প্রসঙ্গে আমার উত্তর হলো, যদি তারা চিমটা দিয়ে আমার মাংস তুলে ফেলে তা-ও আমি মেনে নিব, কিন্তু খিলাফত থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারব না। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই জামা পরিধান করিয়েছেন, আমি তা কখনোই ছেড়ে দিতে পারি না। বাকি রইল তৃতীয় কথা, অর্থাৎ তারা তাদের লোকজন চতুর্দিকে প্রেরণ করবে যেন কেউ আমার কথা মান্য না করে, সেক্ষেত্রে খোদার দৃষ্টিতে আমি এর জন্য দায়ী নই। তারা যদি শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতে চায় তবে করুক। প্রারম্ভেও তারা যখন আমার হাতে বয়আত করেছিল, তার জন্য আমি তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করি নি, তাদেরকে এতে বাধ্য করি নি যে, অবশ্যই আমার বয়আত কর। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে চায়, আমি তার উক্ত কাজে সন্তুষ্ট নই আর না খোদা তা'লা এতে সন্তুষ্ট। এখন যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে চাও, কর, আমি পূর্বেও বলপ্রয়োগ

করি নি আর এখনও করব না, তবে আমি এই কাজে কোনভাবেই সন্তুষ্ট নই, কেননা এটি নিঃসন্দেহে একটি মন্দ কাজ আর আল্লাহ্ তা'লাও এতে সন্তুষ্ট নন। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে যা করতে চায়, করুক। যেহেতু হজ্জের সময় নিকটবর্তী ছিল এবং চতুর্দিক থেকে মানুষ মক্কায় একত্রিত হচ্ছিল, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, উক্ত বিদ্রোহীরা কোথাও আবার সেখানেও কোন নৈরাজ্য সৃষ্টি না করে, সেইসাথে এই কথা মনে করে যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে সমবেত মুসলমানদের কাছে মদিনাবাসীদেরকে সাহয্যের আহ্বান জানাবেন, হযরত উসমান (রা.) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসকে হজ্জের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাসও নিবেদন করেন যে, এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমি অধিক পছন্দ করি। আপনি আমাকে আমীর বানিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করছেন, কিন্তু আমার বাসনা হলো- আমি তাদের সাথে জিহাদ করব। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাকে হজ্জে যেতে এবং হজ্জের দিনগুলোতে হজ্জের আমীরের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন, যেন নৈরাজ্যবাদীরা সেখানে নিজেদের দুষ্টামি ছড়াতে না পারে আর সেখানে একত্রিত লোকদের কাছে মদিনাবাসীদের সাহায্যের আবেদন করা যায় এবং উক্ত পত্র তারই হাতে প্রেরণ করেন।

এই নৈরাজ্যবাদীরা যখন উক্ত পত্রাদি সম্পর্কে জানতে পারে তখন তারা আরো বেশি কঠোরতা প্রদর্শন করা আরম্ভ করে দেয় আর এই সুযোগের সন্ধান করতে থাকে যে, কোনভাবে লড়াইয়ের অজুহাত হাতে আসে যেন তারা হযরত উসমানকে শহীদ করতে পারে। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল আর হযরত উসমান তাদেরকে দুষ্টামি করার কোন সুযোগ দেন নি। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তারা এই ষড়যন্ত্র আঁটে যে, যখন রাত নামতো আর মানুষ ঘুমিয়ে পড়তো তখন হযরত উসমান (রা.)-এর গৃহে তারা পাথর নিক্ষেপ করত আর এভাবে গৃহবাসীদের প্ররোচিত করত যেন উত্তেজিত হয়ে তারাও পাথর নিক্ষেপ করে এবং তারা মানুষকে বলতে পারে যে, দেখ! তারা আমাদের ওপর হামলা করেছে, তাই আমরাও পাল্টা উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) নিজ গৃহের সকল সদস্যকে পাল্টা জবাব দিতে নিষেধ করেন, কোন উত্তর দিতে নিষেধ করেন। একদিন সুযোগ পেয়ে হযরত উসমান (রা.) দেওয়ালের পাশে আসেন এবং বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের মতে আমি অপরাধী। অর্থাৎ, তোমরা যেহেতু আমাকে অপরাধী মনে কর, তবে (ধরে নিলাম) আমি অপরাধী, কিন্তু অন্যরা কী দোষ করেছে? অর্থাৎ, তোমাদের দৃষ্টিতে আমি অপরাধী হলে আমার সাথে যে অন্যায় করতে চাও, কর। অন্যরা কী দোষ করেছে যে, তোমরা পাথর নিক্ষেপ করছ, যাতে অন্যদেরও আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে? তখন তারা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে বলে, আমরা পাথর নিক্ষেপ করি নি। হযরত উসমান (রা.) বলেন, যদি তোমরা নিক্ষেপ না করে থাক তাহলে আর কে নিক্ষেপ করবে? তারা বলে, খোদা তা'লা নিক্ষেপ করে থাকবেন, নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক। হযরত উসমান (রা.) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলছ, যদি খোদা তা'লা আমাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতেন তাহলে তাঁর একটি পাথরও লক্ষ্যচ্যুত হতো না। এমনটি হতো না যে, তাঁর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে। কিন্তু তোমাদের নিক্ষেপকৃত পাথর তো এদিক সেদিক গিয়ে পড়ে। একথা বলে তিনি তাদের সামনে থেকে সরে যান।

যদিও সাহাবীদের তখন হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো না, তথাপি তারা নিজেদের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। সময়ের দাবি অনুযায়ী তারা নিজেদের দায়িত্ব দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। যারা বয়স্ক ও বৃদ্ধ ছিলেন এবং যাদের চারিত্রিক প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর অধিক ছিল, তারা নিজেদের সময় মানুষকে বুঝানোর জন্য ব্যয় করতেন। আর যারা তেমন প্রভাব রাখতেন না বা যুবক ছিলেন, তারা হযরত উসমানের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টায় রত থাকতেন। প্রথমোক্ত দলের মধ্য থেকে হযরত আলী এবং পারস্য-বিজেতা হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস বিশৃঙ্খলা প্রশমিত করার জন্য সবচেয়ে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষভাবে হযরত আলী তো সেই বিশৃঙ্খলার দিনগুলোতে নিজের সব কাজ বাদ দিয়ে এ কাজেই রত থাকতেন। যেমন এসব ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষীদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, বিশৃঙ্খলার সেই দিনগুলোতে আমি দেখেছি, হযরত আলী তার সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং হযরত উসমানের শত্রুদের ক্রোধ প্রশমিত করা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার চিন্তায়ই দিন-রাত মশগুল থাকতেন। একবার তাঁর (রা.) কাছে পানি পৌঁছতে কিছুটা বিলম্ব হলে হযরত আলী হযরত তালহার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন, যার ওপর এই কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল; আর ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্রাম নেন নি যতক্ষণ না হযরত উসমানের গৃহে পানি পৌঁছেছে। দ্বিতীয় দলের লোকেরা একজন দু'জন করে যখনই সুযোগ হতো, খুঁজে খুঁজে হযরত উসমান (রা.) বা তাঁর প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে জড়ো হতে আরম্ভ করেন এবং তারা এই দৃঢ় সংকল্প করে নিয়েছিলেন যে, আমরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দিব, কিন্তু হযরত উসমানের প্রাণের ওপর কোন আঁচ আসতে দিব না। এই দলে হযরত আলী, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়েরের পুত্ররা ছাড়া স্বয়ং সাহাবীদের একটি দল অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা দিন-রাত হযরত উসমানের গৃহের নিরপত্তা রক্ষা করতেন এবং কোন শত্রুকে তাঁর কাছে পৌঁছতে দিতেন না। যদিও এই স্বল্প সংখ্যক মানুষের পক্ষে সেই বিপুল সংখ্যক (শত্রুর) মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু যেহেতু বিদ্রোহীরা কোন একটি ছুতো দেখিয়ে হযরত উসমানকে হত্যা করতে চাইছিল, তাই তারাও (আক্রমণের ব্যাপারে) ততটা জোর দিচ্ছিল না। সেই সময়ের ঘটনাবলী দৃষ্টে ইসলামের কল্যাণের জন্য হযরত উসমানের শুভাকাঙ্ক্ষা যেভাবে প্রতিভাত হয়, তা দেখে হতবাক হতে হয়। বিদ্রোহীদের প্রায় তিন হাজার সৈন্য তার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের হাত থেকে বাঁচার কোন বুদ্ধি নেই; তা সত্ত্বেও যারা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে চাইছিলেন, তাদেরকে ও তিনি বাধা দিচ্ছেন যে, যাও, নিজেদের প্রাণকে বিপদের মুখে ঠেলে দিও না! তাদের শত্রুতা কেবল আমার সাথে, তোমাদের সাথে কোন বিবাদ নেই! তাঁর চোখ সেই সময়টিকে দেখতে পাচ্ছিল, যখন ইসলাম এই বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের কারণে এক ভয়ংকর বিপদে নিপতিত হবে এবং কেবল বাহ্যিক ঐক্যই নয়, বরং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনাও মুখথুবড়ে পড়ার উপক্রম হবে। এছাড়া তিনি জানতেন যে, তখন ইসলামের সুরক্ষা এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য একেকজন সাহাবীর প্রয়োজন হবে। তাই তিনি চাইছিলেন না যে, তার প্রাণ রক্ষা করার অনর্থক চেষ্টায় সাহাবীদের প্রাণ যাক, আর সবাইকে তিনি এই উপদেশই দিতেন যে, তাদের সাথে সংঘাতে যেও না। তিনি চাচ্ছিলেন যতদূর সম্ভব ভবিষ্যৎ বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য (সাহাবীদের) সেই দল অক্ষত থাকুক যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর বোঝানো সত্ত্বেও যেসব সাহাবীর তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ হতো, তারা নিজেদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করতেন না এবং ভবিষ্যতের বিপদের ওপর বর্তমান বিপদকে প্রাধান্য দিতেন। আর উক্ত সময়ে তাদের প্রাণ কেবল এজন্যই নিরাপদ ছিল যে, তারা তাড়াহুড়োর কোন প্রয়োজন অনুভব করছিল না। অর্থাৎ যারা বিদ্রোহী ছিল, তারা তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি আর ছুতো খুঁজছিল। কিন্তু অবশেষে সেই সময়ও এসে যায়। অর্থাৎ তারা হযরত উসমানের ওপর আক্রমণ করার ছুতোর সন্ধানে ছিল।

আর অবশেষে সেই সময়ও এসে যায় যখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কারণ হযরত উসমানের সেই হৃদয়কাঁপানো বাণী, যা তিনি হজ্জে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, তা হাজীদের সমাবেশে শুনিয়ে দেওয়া হয় এবং মক্কা উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর হজ্জে সমাগত মুসলমানরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা হজ্জের পর জিহাদের পুণ্য থেকেও বঞ্চিত থাকবে না এবং মিশরীয় বিশৃঙ্খলাকারী ও তাদের সঙ্গী-সাথীদের নির্মূল করে ছাড়বে। বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের গুপ্তচরেরা তাদেরকে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়ে দেয়। ফলে ঐসকল নৈরাজ্যবাদীদের মাঝে প্রবল ত্রাসের সঞ্চার হয়। এমনকি তাদের মাঝে কানাঘুঁষো চলতে থাকে যে, এখন এই ব্যক্তিকে (তথা হযরত উসমানকে) হত্যা করা ছাড়া গত্যান্তর নেই আর আমরা যদি তাকে হত্যা না করি তাহলে মুসলমানদের হাতে আমরা যে মারা পড়ব - এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ভয়কে আরেকটি সংবাদ দ্বিগুন দৃঢ়তা দান করেছে আর তা হল, সিরিয়া, কুফা আর বসরায়ও হযরত উসমান (রা.)-এর পত্র পৌঁছে গেছে। সেখানকার অধিবাসীরা, যারা পূর্বেই হযরত উসমানের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল, এই পত্র পৌঁছা মাত্র তারা আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর সাহাবীরা নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করে মসজিদগুলোতে এবং সভা-সমাবেশে সমস্ত মুসলমানকে তাদের দায়দায়িত্বের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে এইসকল নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে, এছাড়া তারা বলেছেন, যে ব্যক্তি আজ জেহাদ করবে না, সে প্রকৃতপক্ষে কিছুই করল না। কুফায় উকবা বিন আমর, আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা আর হানযালা বিন রাবিউ আত্তামিমি এবং অন্যান্য সম্মানিত সাহাবীরা জনগণকে মদীনাবাসীর সহায়তার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। অপরদিকে বসরাতে ইমরান বিন হুসাঈন, আনাস বিন মালেক, হিশাম বিন আমের এবং অন্যান্য সাহাবীরা আর সিরিয়ায় উবাদা বিন সামেত, আবু উমামা এবং অন্যান্য সাহাবীরা হযরত উসমান (রা.)-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন সেখানে মিশরে খারেজা এবং অন্যান্য লোকেরা (মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন)। সকল দেশ থেকে সৈন্যরা একত্রিত হয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে। মোটকথা এসব সংবাদে বিদ্রোহীদের ভীতি আরো বেড়ে গেল। অবশেষে হযরত উসমান (রা.)কে হত্যার উদ্দেশ্যে জোর করে তাঁর ঘরে প্রবেশের চেষ্টা চালালো। সাহাবীরা মোকাবিলা করেন এবং উভয়পক্ষের মাঝে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যদিও সাহাবীরা সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু তাঁদের ঈমানী আত্মাভিমান তাদের সংখ্যাস্বল্পতার ঘাটতি পূরণ করছিল। যেখানে যুদ্ধ হয় তথা হযরত উসমান (রা.)-এর ঘরের সামনে, সেখানে জায়গাও সংকীর্ণ ছিল ফলে নৈরাজ্যবাদীরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের সুবিধা কাজে লাগাতে পারে নি। হযরত উসমান (রা.) যখন এই যুদ্ধের বিষয়ে অবগত হলেন, তখন তিনি (রা.) সাহাবীদেরকে যুদ্ধ করতে বারণ করলেন কিন্তু সেই মুহূর্তে তারা হযরত উসমান (রা.)কে একাকী ছেড়ে যাওয়া ঈমানবিরুদ্ধ এবং আনুগত্য-পরিপন্থী জ্ঞান করেন। আর হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক আল্লাহ্‌র কসম দেওয়া সত্ত্বেও তারা ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে হযরত উসমান (রা.) ঢাল হাতে নিলেন এবং বাইরে বেরিয়ে এলেন আর সাহাবীদেরকে নিজ গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন আর দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। এরপর

সাহাবী এবং তার সাহায্যকারীদের ওসিয়্যত করলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে পৃথিবী এ জন্য দেন নি যে , তোমরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে বরং এ উদ্দেশ্যে দিয়েছেন যেন তোমরা এর মাধ্যমে পরকালের সম্পদ জমা করো। এ জগত তো বিলীন হয়ে যাবে আর পরকালই অবশিষ্ট থাকবে। অতএব এই নশ্বর জিনিস যেন তোমাদেরকে উদাসীন বানিয়ে না দেয়। অবিনশ্বর বিষয়কে নশ্বর বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দাও আর আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাৎকে স্মরণ কর। আর জামা'তকে বিভক্ত হতে দিও না। আর সেই ঐশী নেয়ামতকে ভুলবেনা যে তোমরা ধ্বংসকারী গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিলে, আর আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে তোমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়ে ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি সকলকে বিদায় দিলেন আর বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুরক্ষা করুন। তোমরা এখন ঘর থেকে বাইরে যাও আর ঐ সাহাবীদেরকে ডাকো– যাদেরকে আমার পর্যন্ত পৌঁছতে দেওয়া হয় নি। বিশেষ করে হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরকে। তারা বাইরে আসলেন আর অপরাপর সাহাবীদেরকেও ডাকা হলো। সে সময় এমন পরিবেশ বিরাজ করছিল আর এমন বিষন্নতা ছেয়ে যাচ্ছিল যে, বিদ্রোহীরাও এতে প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। যখন তিনি (রা.) বললেন যে, বাইরে চলে যাও তখন সাহাবীরা বের হলেন; সাময়িক ভাবে বিরাজমান আবহ এমন ছিল যে বিদ্রোহীরা (তাদের ওপর) কোনরূপ আক্রমণ করে নি। অতএব তারা বাইরে বের হলেন এবং সমস্ত জ্যেষ্ঠ সাহাবীকে একত্রিত করলেন। আর কেনই বা এমনটি হবে না কেননা সবাই সচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিল যে, মহানবী (সা.) –এর প্রজ্জ্বলিত এক বাতি নিজ বয়সসীমা পূর্ণ করে এ নশ্বর পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিলেন।

মোটকথা বিদ্রোহীরা খুব একটা প্রতিরোধ গড়ে নি ফলে, সাহাবীরা একত্রিত হলেন। যখন লোকেরা একত্রিত হল তখন তিনি (রা.) ঘরের দেওয়ালের ওপরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা আমার কাছাকাছি আসো। সবাই যখন কাছাকাছি আসল তখন তিনি (রা.) বললেন, হে লোকসকল! বসে পড়। একথা শুনে সাহাবীদের সাথে বিদ্রোহীরাও বৈঠকের আবহে প্রভাবিত হয়ে বসে পড়লো। সবাই বসার পর তিনি (রা.) বলেন, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদেরকে আমি খোদা তা'লার কাছে সোপর্দ করছি এবং তাঁর কাছে দোয়া করি যে, তিনি যেন তোমাদের জন্য আমার পরে খেলাফতের উত্তম ব্যবস্থা করেন। আজকের পর আমি বাইরে বের হব না সেই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না খোদা তা'লা আমার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন; আর আমি কাউকে এমন কোন ক্ষমতা দিয়ে যাব না যার বলে বলিয়ান হয়ে সে ধর্মীয় এবং জাগতিক ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর শাসন করবে এবং এবিষয়টি খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দিব, যাকে খুশি তিনি তাঁর কাজের জন্য বেছে নেবেন। এরপর তিনি (রা.) সাহাবীদের এবং অন্যান্য মদীনাবাসীকে কসম দিয়ে বলেন, তাঁর জীবনের নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে তারা যেন তাদের প্রাণকে মহাবিপদের মুখে ঠেলে না দেয় এবং তারা যেন বাড়ি ফিরে যায়। তাঁর (রা.) এই আদেশ সাহাবীদের মাঝে এমন একটি বিরাট বড় মতানৈক্য সৃষ্টি করে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহাবীরা আনুগত্য ভিন্ন অন্য কিছুই জানতেন না কিন্তু আজ এই আদেশ মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কারো কারো কাছে আনুগত্য নয় বরং বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পরিলক্ষিত হয়। (কারো কারো মতে) আমরা একথা মানলে তা আনুগত্য নয় বরং তা বিশ্বাসঘাতকতা। কতক সাহাবী আনুগত্যের দিকটিকে অগ্রগণ্য মনে করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এরপর শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন আর সম্ভবত: তারা মনে করেছিলেন যে, আমাদের কাজ হলো কেবল আনুগত্য করা; এই আদেশের আনুগত্য করার পরিণাম কী হবে– তা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। অনেক সাহাবী এই আদেশ মান্য করতে অস্বীকৃতি জানায় কেননা তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, খলিফার আনুগত্য নিঃসন্দেহে আবশ্যক কিন্তু খলিফা যখন এই আদেশ প্রদান করেন যে, তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যাও; তবে এর অর্থ হলো– খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা পরিত্যাগ কর। অতএব এই আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে আর তাঁরা এটিও দেখছিলেন যে, হযরত উসমান (রা.)'র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ তাঁদের অর্থাৎ সাহাবীদের জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে –ই ছিল; তাই (তাদের মাথায় প্রশ্ন জাগে) যে তাঁরা কি এমন স্নেহবৎসল ব্যক্তিকে বিপদের মুখে একা ছেড়ে দিয়ে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারতেন? কারণ হযরত উসমান (রা.) তো তাঁদের ভালবাসার কারণে তাঁদের প্রাণ বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করছেন আর তাঁরা কিনা হযরত উসমান (রা.)–কে একা ছেড়ে দিবেন– এটি (তাদের জন্য) ছিল অসম্ভব। এই শেষোক্ত দলটিতে সকল শীর্ষস্থানীয় সাহাবীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব এই আদেশ সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.)–এর পুত্ররা তাঁদের স্ব –স্ব পিতার আদেশ অনুযায়ী নগ্ন তরবারী নিয়ে হযরত উসমান (রা.)–এর দ্বারেই অবস্থান করেন ।

হজ্জব্রত পালন করে প্রত্যাবর্তনকারীদের গুটিকতক যখন মদীনাতে প্রবেশ করতে লাগল আর তারা বুঝল যে, এখন আমাদের ভাগ্য নির্ধারণের সময় সন্নিকটে তখন বিদ্রোহীদের অস্থিরতা ও উত্তেজনার কোন সীমা রইল না। অতএব মুগীরা বিন আখনাস সর্বপ্রথম ব্যক্তি ছিল যে হজ্জের পরে জিহাদের সওয়াবের বাসনায় মদীনাতে প্রবেশ করেন আর তখনই এই সংবাদ বিদ্রোহীরা পায় যে, মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য আগত বসরাবাসীদের সেনাদল সিরার নামক স্থানে এসে পৌঁছেছে; যা মদীনা থেকে কেবল এক দিন সফরের দূরত্বে অবস্থিত। এই সমস্ত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যেকোন মূল্যে আমাদের লক্ষ্য দ্রুত অর্জন করতে হবে । আর সেসব সাহাবী ও তাদের সাথীরা যারা হযরত উসমান (রা.)'র নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হযরত ওসমানের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন থেকে সরে দাড়ান নি আর পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের মোকাবিলার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা আপনাকে একা ছেড়ে দিই তাহলে খোদা তা'লাকে কীভাবে মুখ দেখাব? সংখ্যাস্বল্পতা কারণে তখন তাঁরা বাড়ির ভিতর থেকে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন আর (তাই) বিদ্রোহীদের জন্য বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত আসা কোন সমস্যাই ছিল না। তারা দরজা পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং ভিতরে যাওয়ার পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে দরজার সামনে শুকনো কাঠ জমা করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সাহাবীরা বিষয়টি লক্ষ্য করে বাড়ির ভিতরে বসে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। তাঁরা তরবারি হাতে নিয়ে বাইরে বেরতে উদ্যত হয় কিন্তু হযরত উসমান (রা.) বাধ সাধেন এবং বলেন যে, বাড়িতে আগুন দেওয়ার পরে আর কী বাকি রইল? এখন যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। তোমরা নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিও না এবং নিজেদের ঘরে চলে যাও। এদের শুধু আমার প্রতি শত্রুতা রয়েছে। কিন্তু অচিরেই এরা এদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে যার ওপর আমার আনুগত্য করা আবশ্যক– সেই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিচ্ছি এবং আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাহাবীগণ এবং অন্যান্য লোকেরা এটি মানে নি, বরং তারা তরবারি বের করে বাইরে বের হয়। তাদের বাইরে বের হওয়ার সময় হযরত আবু হুরায়রা (রা.)ও চলে আসেন এবং তিনি সৈনিক না হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে যোগ দেন এবং বলেন আজকের দিনের লড়াইয়ের চাইতে উত্তম আর কোন লড়াই হতে পারে? এরপর বিদ্রোহীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, يٰقَوْمِ مَالِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ অর্থাৎ হে আমার জাতি! কি হয়েছে যে আমি তোমাদেরকে মুক্তির পানে ডাকছি আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে ডাকছ। (সূরা মু'মিন: ৪২)

এটি একটি বিশেষ যুদ্ধ ছিল এবং মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন সাহাবী– যারা তখন একত্রিত হতে পেরেছিলেন, তারা জীবনবাজী রেখে এ বড় সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করেছিলেন। হযরত ইমাম হাসান যিনি খুবই শান্তিপ্রিয় বরং শান্তির রাজপুত্র ছিলেন, তিনিও সেদিন রণসঙ্গীত পড়ে পড়ে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করেন। তার এবং মুহাম্মদ বিন তালহার ঐ দিনের রণসঙ্গীত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা এর মাধ্যমে তাদের হৃদয়ের চিত্র স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। হযরত ইমাম হাসান নিম্নোক্ত পংক্তি পড়ে বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমন করছিলেন।

"লা দিনুহুম দিনী ওয়া লা আনা মিনহুম / হাত্তা আসিরা ইলা তামারি শামাম"

অর্থাৎ তাদের ধর্ম আমার ধর্ম নয় এবং তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আর আমি তাদের সাথে ততক্ষন পর্যন্ত লড়াই করতে থাকব যতক্ষন পর্যন্ত শামাম পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছাই। শামাম আরবের একটি পাহাড় যার চূড়া পর্যন্ত পৌঁছানোকে লক্ষ্য অর্জনের সাথে তুলনা করা হয়। যাহোক হযরত ইমাম হাসান (রা.) এটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অভিষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছাব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবো আর তাদের সাথে সন্ধি করবো না, কেননা আমাদের মধ্যে কোন সাধারণ বিষয়ে মতবিরোধ হচ্ছে না যে, তাদের উপর বিজয় অর্জিত না করেই আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নেব। এটিতো সেই চিন্তাভাবনা যা শান্তির যুবরাজের মনে উদ্বেলিত হয়েছিল। এখন আমরা হযরত তালহা (রা.)–এর পুত্র মুহাম্মদের রণসঙ্গীতটি বিশ্লেষণ করি; তিনি বলেন

"আনাব্নু মান হামা আলাইহে বেউহুদিন,
ওয়া রাদ্দা আহ্যাবান আলা রাগমে মাআদ্দিন"

অর্থাৎ আমি তার পুত্র যিনি উহুদের দিন রসূলে করীম (সা.)–এর সুরক্ষা করেছিলেন আর যিনি আরবদের সকল শক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। অর্থাৎ আজকের দিনটি উহুদের মতোই একটি ঘটনা। আর যেভাবে আমার পিতা তির প্রতিহত করতে গিয়ে নিজ হাত ঝাঝরা করেছিলেন কিন্তু রসূলে করীম (সা.)–এর শরীরে কোন আঁচ আসতে দেন নি, আমিও তেমনটিই করবো। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)ও সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং মারাত্মকভাবে আহত হন। মারওয়ানও অনেক আহত হন আর মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গিয়ে ফেরত আসেন। মুগীরা ইবনুল আখনাস মৃত্যুবরণ করেন আর যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছিলো সে এই দৃশ্য দেখে যে আহত হন নি কেবল বরং মারা গেলেন, তখন সে অনেক উচ্চ স্বরে ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন বলেন। সৈন্যদলের প্রধান তাকে এই বলে ধমক দিল যে, এমন আনন্দের মুহূর্তে দুঃখ প্রকাশ করছো!। সে বললো আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি কোন এক ব্যক্তি বলছে যে, মুগীরার হত্যাকারীকে জাহান্নামের সংবাদ দাও। অতএব আমিই যে তার হত্যাকারী এই বিষয়টি অনুধাবন করার পর আমার ব্যথিত হওয়া আবশ্যক ছিল। উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আরো অনেকেই আহত ও নিহত হন আর এভাবে হযরত উসমান (রা.)–এর সুরক্ষাকারী দলের

সংখ্যা আরো কমে যায়। কিন্তু বিদ্রোহীরা ঐশী সর্তকবাণী শোনার পরও নিজেদের হঠকারিতা থেকে নিবৃত হয় নি। তারা খোদা তা'লার প্রিয় জামাতের বিরোধিতা অব্যাহত রাখে। অপরদিকে নিষ্ঠাবান মুসলমানরাও নিজেদের ঈমানের উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে কোন ত্রুটি রাখে নি। অধিকাংশ সুরক্ষাকর্মী নিহত হওয়া সত্ত্বেও বা আহত হওয়া সত্ত্বেও একটি ক্ষুদ্র দল অনবরত দরজা সুরক্ষার কাজে রত থাকেন। (ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড,পৃ:৩১৪-৩২৭)

যাহোক, ঘটনা তুলে ধরার ধারাবাহিকতা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকবে; পরবর্তী জুমুআয় উপস্থাপন করবো, ইনশাআল্লাহ্। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য পুনরায় দোয়ার অনুরোধ করছি আর আলজেরিয়ার জন্যও দোয়া করবেন; সেখানে মামলার বিচারকাজ পুনরায় শুরু হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা তাদের সবার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন আর বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতন ও কঠোরতা সত্বর দূর করে সাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করুন।

এখন নামাযের পর আমি কতিপয় প্রয়াত ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, এখানে তাদের উল্লেখ করে দিচ্ছি। প্রথমে যার স্মৃতিচারণ করবো তিনি হলেন কাদিয়ানের নায়েব নাযের দাওয়াত ইলাল্লাহ্ (দক্ষিণ ভারত) মোকাররম মৌলভী নজীব খান সাহেব। তিনি কেরালার আরনাকুলাম জেলার অন্তর্গত আহমদীয়া জামা'ত কাকনাডের মরহুম মাস্টার বিএম মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারী তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তিনি আল্লাহর কৃপায় মুসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে বিধবা স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন আর তিন পুত্রই ওয়াকফে নও-এর কল্যাণময় তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত আছে। এক ছেলে জামেয়া আহমদীয়াতে অধ্যয়ন করছে। মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন না, বরং সতেরো বছর বয়সে নিজ পিতার মাধ্যমে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে অবগত হয়ে জামাতী বই-পুস্তক এবং ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী পুস্তক অধ্যয়ন করতে থাকেন। একদিন তিনি তার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, 'একজন বালক কত বছর বয়সে নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে?' এর উত্তরে মরহুমের পিতা বলেন, 'মানুষ সতেরো-আঠারো বছর বয়সে নিজ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।' একথা শুনে মরহুম মওলানা মুহাম্মদ আলভী সাহেবের মাধ্যমে বয়আত গ্রহণ করে জামাতভুক্ত হন। বয়আত সম্পর্কে মওলানা আলভী সাহেব নিজের একটি স্বপ্ন বর্ণনা করে বলেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তার প্রতি অনেকগুলো নক্ষত্র ছুটে আসছে, যেগুলোর মধ্যে একটি ছোট নক্ষত্র খুবই দ্রুতবেগে ধেয়ে আসছে। আলভী সাহেব এই ছোট নক্ষত্র বলতে মৌলভী মুহাম্মদ নজীব খান সাহেব মরহুমকে মনে করতেন। যাহোক, তিনি পরিবারে সর্বপ্রথম বয়আতকারী ছিলেন। তার পিতা জামাত সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু তখনো আহমদী হন নি। পরবর্তীতে মরহুমের প্রচেষ্টায়ই মা, ভাই এবং পিতা বয়আত করেন। বয়আত গ্রহণের পর মরহুম এক স্বপ্নের ভিত্তিতে জামেয়া আহমদীয়াতে ভর্তি হন এবং ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসাবে জামাতের সেবা করার সিদ্ধান্ত নেন। জামেয়া পাশ করার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তার নিয়োগ হয়; প্রথমে চন্ডিগড়ে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় মোবাল্লেগ হিসাবে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে আমি তাকে নায়েব নাযের দাওয়াত ইলাল্লাহ নিযুক্ত করি। একইভাবে নূরুল ইসলাম বিভাগের নায়েব ইনচার্জ হিসাবে তবলীগের কাজ খুব ভালোভাবে করছিলেন; সেখানে ভালো কাজ করেছেন।

তিনি নামায-রোযায় যত্নবান ছিলেন; তাহাজ্জুদ-গুযার ছিলেন, খেলাফতের সাথে সত্যিকার সম্পর্ক রক্ষাকারী, বিশ্বস্ততা এবং প্রকৃত ভালোবাসা ও আন্তরিকতা রাখতেন। প্রত্যেকটি কাজ নিষ্ঠার সাথে খুবই সুন্দরভাবে, গুছিয়ে যথাসময়ে সম্পাদন করতেন। কাজ একাগ্রতার সুন্দরভাবে গুছিয়ে এবং যথা সময়ে করা তার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ইবাদতের প্রতি বিশেষ মনোযোগি ছিলেন এবং পরিবারের সদস্যদেরও তিনি এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। বান্দার অধিকার প্রদানেও বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করতেন।

নূরুল ইসলাম বিভাগের প্রধান শিরাজ সাহেব লিখেন, মরহুম নিয়মিতভাবে বায়তুদ দোয়াতে এসে দোয়া করতেন। অত্যন্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন, নিঃস্বার্থ ধর্মসেবার চেতনায় সমৃদ্ধ ছিলেন। যুগ-খলীফার তরবিয়তী এবং তবলীগী টার্গেট পূরণের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। জামাতের বইপুস্তক মালায়ালাম ভাষায় অনুবাদ এবং অনুবাদকৃত বই রিভিউ ও চেকিং-এর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমের এসব সেবামূলক কাজ সম্পর্কে কাদিয়ানের নাযের নাশর ও ইশায়াত সাহেব বলেন, 'মরহুম আল ওসীয়্যত, তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়্যা, ইরফানে ইলাহী, কায়েদা-ইয়াসসারনাল কুরআন এবং তাহরীকে ওয়াকফে নও সম্পর্কে আমার খুতবাসমূহ মালায়ালাম ভাষায় অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এছাড়া তফসীরে সগীর মালায়ালাম ভাষায় পুনর্মুদ্রণ করার সময় চেক করারও তৌফিক লাভ করেছেন। তার লিখিত মালায়ালাম ভাষায় তিন খণ্ডের একটি বই 'নিসাবে তালীম' রয়েছে।' ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত কেরালা প্রদেশের রিভিউ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য পান। কেরালা প্রদেশের আরনাকুলাম জেলার আমীর জনাব আবু বকর সাহেব বলেন, 'তার মাঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখা অনুবাদ করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক অদম্য প্রেরণা ছিল। দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিদের দৃঢ়চিত্ততার মর্যাদায় উপনীত করার জন্য এবং তাদেরকে অবিচল রাখার জন্যও সর্বদা চেষ্টা করতেন।' আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল, চৌধুরী আহমদ দীন চাট্ঠা সাহেবের পুত্র এবং মুনীর বাসমাল সাহেব, এডিশনাল নাযের ইশায়াত-এর বড়ভাই নযীর আহমদ খাদেম সাহেবের। ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার দাদা চৌধুরী শাহ দীন সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াত এসেছিল। নযীর খাদেম সাহেব কলেজে অধ্যয়নের সময় থেকেই ধর্মসেবার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে লেখা এবং বক্তৃতায় বিশেষ দক্ষতায় ভূষিত করেছিলেন। জৌবনকাল থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তার বক্তৃতা, লেখা এবং ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে ধর্মসেবা ও ধর্মপ্রচারের কাজে রত ছিলেন। খোদ্দামুল আহমদীয়া রাবওয়াতে মুআবিন সদর ছিলেন, এছাড়া মোতামাদ হিসেবেও কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর বাহাওয়াল নগর জামাতের নায়েব আমীর হিসেবেও সেবা করেন, মজলিস আনসারুল্লাহ'র নায়েব কায়েদ উমুমী হিসেবে কাজ করারও সৌভাগ্য পান; দারুল কাযা, রাবওয়ার কাযীর পদেও নিযুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার উত্তরসূরী ও তার সন্তানদের তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে জনাব আলহাজ্ব ডাক্তার ড. নানা মোস্তফা এটিবটিং সাহেবের, যিনি ঘানাতে আলহাজ্জ চোচো নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ১৭ জানুয়ারী ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন।

খৃষ্টান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; ১৯৭৯ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তার কর্মজীবন আরম্ভ করেন একজন ড্রাইভার হিসেবে। তাঁর আমীর আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেবের সাথে দীর্ঘকাল ড্রাইভার হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়। ইংল্যান্ড ও ঘানাতে জামাতের প্রেসে কাজ করারও সৌভাগ্য হয়েছে। কিছুদিন তিনি জাপানেও ছিলেন আর সেখানে তাকে জামাতের স্থানীয় প্রেসিডেন্টও বানানো হয়েছিল। আমি যখন সেখানে গিয়েছি তখন দেখেছি, তিনি খুবই হাসীখুশী থাকতেন, সবসময় ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। যদিও কোন পদ ছিল না, তবুও সবসময় সব কাজের জন্য প্রস্তুত থাকার চেষ্টা করতেন। পরে তিনি নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন আর ব্যবসায় উন্নতি করতে করতে ঘানার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। চোচো ইন্ড্রাস্ট্রী নামে তার একটি কারখানাও ছিল। তিনি এই ব্যবসায়িক সাফল্য আল্লাহ তা'লার কৃপার পাশাপাশি যুগ খলীফার দোয়া এবং আল্লাহর পথে কুরবানীর প্রেরণার কারণেই হয়েছে বলে জ্ঞান করতেন। তিনি অনেক আর্থিক কুরবানী করতেন। ঘানার ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ হিসেবে ১১ বছর কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট হিসেবেও তিনি জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। মরহুম আল্লাহ তা'লার কৃপায় মুসী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনজন স্ত্রী ও তিন কন্যা রয়েছে। তার এক পুত্রও ছিল যে কয়েক বছর পূর্বে মারা গিয়েছিল।

কুফে রিডওয়ার মিশনারী মোবারক আহমদ আদিল সাহেব; লিখেন, 'তার গুণাবলীর মধ্যে ধর্ম ও মানবতার সেবায় সময় ও অর্থের অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করা এবং বিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। তাহাজ্জুদ ও পাঁচবেলার নামায পড়ার বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। রীতিমত ও যথাসময়ে সব চাঁদা পরিশোধ করতেন। একটি মসজিদ তিনি সম্পূর্ণ নিজের খরচে বানিয়েছেন আর বহু মসজিদ নির্মাণে অর্ধেকের চেয়ে বেশি ব্যয়ভার বহন করেছেন। একইভাবে কোন কোন মিশন হাউস নির্মাণ এবং সংস্কার কাজেও বড় অংক ব্যয় করেছেন। জামাতের জায়গা-জমি কেউ জবরদখল করলে বা অন্য কোন সমস্যা দেখা দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি স্বয়ং উকিল করে এর তদারকি করতেন এবং সাকুল্য ব্যয় নিজে বহন করতেন, জামাতের কাছ থেকে নিতেন না। আহমদীয়াদের বাণী প্রচারের জন্য তার হৃদয়ে এক বিশেষ প্রেরণা ও আগ্রহ ছিল। তিনি তার পিতামাতাকেও তবলীগ করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত করেন। বিগত দশ বছরেরও অধিক সময় যাবৎ একটি রেডিও চ্যানেলে, নিজের খরচে (প্রতিদিন) আধা ঘন্টার একটি তবলীগি অনুষ্ঠান করাতেন যা ঘানার অর্ধেক জনবসতি শুনতে পায়, আর যা এখনও অব্যাহত আছে। এছাড়া তার একটি টিভি চ্যানেলও ছিল, তাতেও নিজের খরচে সাপ্তাহিক তবলীগি অনুষ্ঠান করাতেন; ভিডিও অনুষ্ঠান হতো এবং তবলীগ সংক্রান্ত সম্প্রচার হত। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে জামাতের বাণী পৌঁছেছে আর শত শত মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করেছে। শুধুমাত্র তবলীগের কাজের জন্য একটি গাড়ী বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। তবলীগী ও তরবীয়তি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সুবিধে ও গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে তিনি কোন কোন মোয়াল্লেম ও মুরব্বীকে মোটরসাইকেল এবং কতককে গাড়িও কিনে দিয়েছিলেন; গোপনেও তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করতেন আর জামাতের সদস্যদের উপদেশ দিয়ে বলতেন, 'আহমদীয়াতকে নিজের ব্যক্তিগত ও মূল্যবান সম্পদের মত প্রিয় ও মূল্যবান জ্ঞান করে নিষ্ঠার সাথে এর সেবা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তবলীগের জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করুন,

# জুমআর খুতবা

**হযরত ওসমান কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, বরং অতি উন্নত মানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। জাগতিক সম্মানের দিক থেকেও তিনি (রা.) অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁর (রা.) প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।**

**আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ, যুন নুরাইন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।**

**আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে তোমরা কখনোই একত্রে নামায পড়তে পারবে না আর কখনোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবে না। আর তোমরা অবশ্যই পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত হবে।**

**হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী হযরত উসমানের সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এই আনসাররা দরজায় উপস্থিত রয়েছে আর বলছে যে, আপনি যদি সম্মত থাকেন তাহলে আমরা পুনরায় আল্লাহ্‌র আনসার হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। একথা শুনে হযরত উসমান (রা.) বলেন, না, মোটেও যুদ্ধ করবে না।**

**চার মরহুমের স্মৃতিচারণ ও তাদের জানাযা গায়েব। যারা হলেন-**

**মাননীয় মৌলবী মহম্মদ ইদ্রিস তেরো সাহেব (মুবাল্লিগ, আইভোরি কোস্ট), মাননীয়া আমিনা নায়েগা কায়েরা, ইউগান্ডার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ এর সহধর্মিনী), মাননীয় লুইয়ী কাযাক সাহেব (সিরিয়া) এবং মাননীয়া ফারহাত নাসীম সাহেব (রাবোয়া)।**

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১২ ফেব্রুয়ারী,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা ১২ আমান, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। হযরত উসমান (রা.) মৃত্যুর প্রায় এক বছর পূর্বে জীবনের শেষ হজ্জ করেছিলেন যখন নৈরাজ্য চরম রূপ ধারণ করেছিল। যাহোক, তাঁর শেষ হজ্জের সময় নৈরাজ্যবাদীরা মাথাচাড়া দিতে আরম্ভ করেছিল আর হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা.) তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হজ্জ থেকে ফেরার পথে হযরত মু'আবিয়া (রা.)'ও হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে মদিনায় আসেন। কিছুদিন অবস্থানের পর ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করেন, নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি এ সম্পর্কে কিছু নিবেদন করতে চাই। হযরত উসমান (রা.) বলেন, বলুন। তখন তিনি বলেন, আমার প্রথম পরামর্শ হলো, আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন; কেননা সিরিয়াতে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিরাজমান আর কোন ধরনের নৈরাজ্য নেই। এমন যেন না হয় যে, হঠাৎ কোন নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিবে আর তখন (এ থেকে উত্তরণের) কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে তাকে বলেন, আমার শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেললেও আমি মহানবী (সা.)-এর নৈকট্য কোনক্রমেই পরিত্যাগ করতে পারব না। হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন, তাহলে দ্বিতীয় পরামর্শ হলো, আপনি আমাকে একটি সিরিয়ান সৈন্যদল আপনার নিরাপত্তার খাতিরে প্রেরণ করার অনুমতি দিন। তাদের উপস্থিতিতে কেউ দুষ্কৃতি করতে পারবে না। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে বলেন, উসমানের নিজ প্রাণের নিরাপত্তার খাতিরে বাইতুল মালের ওপর এত বড় বোঝা আমি চাপাতে পারি না আর সেনাদল নিয়োগ করে মদিনাবাসীদের কষ্টে নিপতিত করাও পছন্দ করি না। তখন হযরত মুআবিয়া(রা.) নিবেদন করেন, তাহলে তৃতীয় পরামর্শ হলো, সাহাবীরা যদি উপস্থিত থাকে তাহলে এরা হযরত উসমান (রা.)-এর অবর্তমানে সাহাবীদের মধ্য হতে কাউকে সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার সাহস পাবে। তাই, তাদেরকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিন। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে বলেন, মহানবী (সা.) যাদেরকে একত্রিত করেছেন আমি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত বা ছত্রভঙ্গ করে দিব- তা কীভাবে সম্ভব? একথা শুনে হযরত মুআবিয়া (রা.) কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং নিবেদন করেন, আমি আপনার নিরাপত্তার খাতিরে যেসব প্রস্তাব বা পরামর্শ দিয়েছি এর মধ্য হতে আপনি যদি একটিও গ্রহণ না করেন তাহলে কমপক্ষে জনসমক্ষে এ ঘোষণা করে দিন যে, যদি আমার প্রাণের কোন ক্ষতি হয় তাহলে মুআবিয়ার অধিকার থাকবে আমার পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করার। হতে পারে, মানুষ এতে ভয় পেয়ে দুষ্কৃতি করা থেকে বিরত থাকবে। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে বলেন, মুআবিয়া! যা হওয়ার তা হবেই, আমি এমনটি করতে পারব না, কেননা আপনার প্রকৃতি কঠোর; পাছে এমন না হয় যে, আপনি মুসলমানদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবেন। তখন হযরত মুআবিয়া কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছ থেকে উঠে আসেন আর বলেন, আমি মনে করি- সম্ভবত এটিই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। বাইরে বেরিয়ে এসে সাহাবীদের তিনি বলেন, ইসলামের উন্নতি আপনাদেরকে কেন্দ্র করে। হযরত উসমান (রা.) এখন একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছেন আর নৈরাজ্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আপনারা তাঁর খেয়াল রাখবেন- একথা বলে মুআবিয়া সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

(ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাতা কা আগায, আনওয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৮৫-২৮৬)

হযরত উসমান (রা.)-এর যে দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতা ছিল সে সম্পর্কে মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রা.) তাঁর ঘর থেকে উঁকি মেরে অবরোধকারীদের বলেন, 'হে আমার জাতি! আমাকে হত্যা করো না, কেননা আমি যুগের হাকেম বা ইমাম এবং তোমাদের মুসলমান ভাই। খোদার কসম, আমার অবস্থান সঠিক হোক বা ভুল, আমি সর্বদা সংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। স্মরণ রেখো, তোমরা যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে তোমরা কখনো একত্রে নামায আদায় করতে পারবে না, ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদও করতে পারবে না, আর গনিমতের সম্পদও তোমরা ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, অবরোধকারীরা একথা মানতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময়, যখন সবাই ঐক্যবদ্ধ ছিলে এবং সবাই ধর্ম ও সত্যপথে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলে, খিলাফত সম্পর্কে কি সেই দোয়া কর নি, যা তোমরা করেছিলে? তবে কি তোমরা এখন একথা বলতে চাইছ যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের দোয়া কবুল করেন নি? নাকি একথা বলতে চাইছ যে, এখন আর আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের কোন পরোয়া নেই? নাকি একথা বলতে চাইছ যে, আমি এটি তথা খিলাফতকে তরবারির জোরে বা জোরপূর্বক করায়ত্ত করেছি, মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে এটি অর্জন করি নি! নাকি তোমরা মনে করছ যে, আমার খিলাফতকালের প্রাথমিক যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমার সম্পর্কে সেসব বিষয় অবগত ছিলেন না যা পরবর্তীতে জানতে পেরেছেন। তা সম্ভব নয়, কেননা আল্লাহ্ তা'লা সবই জানেন। এসব কথা সত্ত্বেও যখন অবরোধকারীরা তাঁর কথা মানে নি তখন তিনি (রা.) দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি এদেরকে ভালোভাবে গুণে রাখ আর এদের সবাইকে বেছে বেছে ধ্বংস করো আর এদের কাউকেই ছেড়ো না। মুজাহেদ বলেন, এই নৈরাজ্যে যারাই অংশগ্রহণ করেছে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)

আবু লায়লা কিন্দী বর্ণনা করেন, আমি হযরত উসমান (রা.)-কে অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখেছি, তিনি একটি ঘুলঘুলির আড়াল থেকে উঁকি মেরে বলেন, হে লোকসকল! আমাকে হত্যা করো না আর আমার যদি কোন অপরাধ থেকে থাকে তাহলে আমাকে তওবার সুযোগ দাও। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে তোমরা কখনোই একত্রে নামায পড়তে পারবে না আর কখনোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবে না। আর তোমরা অবশ্যই পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে বলেন, তোমরা এভাবে বিবাদ বিসম্বাদে জড়িয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বলেন,?

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ أَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ-

(সূরা হূদ: ৯০)

অর্থাৎ, আর হে আমার জাতি! আমার সাথে শত্রুতা যেন কখনো তোমাদের এমন কাজে প্ররোচিত না করে যার ফলে তোমাদের ওপরও তেমনই বিপদ আপতিত হবে যেমনটি নূহের জাতি, হূদের জাতি এবং সালেহ্‌র জাতির ওপর আপতিত হয়েছিল আর লূতের জাতি তোমাদের যুগ থেকে বেশি দূরের নয়।

হযরত উসমান (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালামকে ডেকে পাঠান। তিনি এসে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, আপনার মতামত কী? এই যে এত

কিছু হচ্ছে, এ বিষয়ে আপনার মতামত কী? এর উত্তরে হযরত উসমান (রা.) বলেন যে, যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধ এড়িয়ে চল, কেননা এটি তোমাদের সপক্ষে দলিল হিসাবে অধিকতর দৃঢ় হবে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯)

মুহাম্মদ বিন সীরীন বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী হযরত উসমানের সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এই আনসাররা দরজায় উপস্থিত রয়েছে আর বলছে যে, আপনি যদি সম্মত থাকেন তাহলে আমরা পুনরায় আল্লাহ্‌র আনসার হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। একথা শুনে হযরত উসমান (রা.) বলেন, না, মোটেও যুদ্ধ করবে না। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, 'ইয়াওমুদ্ দ্বার' তথা অবরোধের দিন আমি হযরত উসমান (রা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি, হে আমীরুল মোমেনীন! এখন তো তরবারি ধারণ করাই সমুচিত। তিনি বলেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কি পছন্দ করবে যে, তুমি আমাকে সহ অন্য সবাইকে হত্যা করে ফেলবে? আমি বললাম, না। এতে তিনি বলেন, খোদার কসম, তুমি যদি একজনকেও হত্যা কর তাহলে প্রকারান্তরে সবাইকেই হত্যা করলে। হযরত আবু হুরায়রা বলেন, একথা শুনে আমি ফিরে আসি এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি নি। প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছিলেন, আজই যুদ্ধ করার সুর্বণ সুযোগ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন, আমি অবরোধের দিন হযরত উসমান (রা.) -এর সকাশে নিবেদন করি, হে আমীরুল মুমিনীন! এই নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ করুন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা আপনার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বৈধ করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাদের সাথে কখনোই যুদ্ধ করব না।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা তার (রা.) গৃহে ঢুকে যায়, তখন তিনি (রা.) রোযাদার ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তার গৃহের সদর দরজায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরকে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করতে চায়, তার উচিত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়রের আনুগত্য করা। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বলেন, আমি হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট নিবেদন করি, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার গৃহে আপনার সুরক্ষার জন্য নিশ্চয় একটি দল রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'লার সাহয্যপুষ্ট এবং অবরোধকারীদের তুলনায় সংখ্যায় কম। সুতরাং আপনি আমাকে এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করুন। এটি শুনে হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, অথবা বলেন, তোমাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে নসীহত করছি, কোন ব্যক্তি যেন আমার জন্য নিজের রক্ত প্রবাহিত না করে অথবা আমার জন্য অন্য কারো রক্ত না ঝরায়। (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯)

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত-পূর্ব নৈরাজ্য এবং তার (রা.) শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,বিদ্রোহীরা যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে জয়লাভ করেছিল, তারা শেষ চেষ্টা হিসেবে পুনরায় এক ব্যক্তিকে হযরত উসমানের নিকট প্রেরণ করে যেন তিনি খিলাফতের আসন থেকে সরে দাঁড়ান, কেননা তাদের ধারণা ছিল, তিনি (রা.) যদি নিজে খিলাফতের আসন থেকে সরে দাঁড়ান, তবে মুসলমানরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কোন সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ বিদ্রোহীদেরকে শাস্তি দেওয়ার কোন সুযোগ মুসলমানদের থাকবে না। হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট যখন বার্তাবাহক আসে তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি অজ্ঞতার যুগেও পাপ থেকে দূরে ছিলাম এবং ইসলাম গ্রহণের পরও কখনো ইসলামি বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিনি। যে পদমর্যাদা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাকে দান করেছেন, আমি কেন আর কোন্ অপরাধে সেই পদ ছেড়ে দিব? যে জামা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পরিয়েছেন তা আমি কখনোই খুলব না। সেই বার্তাবাহক এই উত্তর শুনে ফিরে আসে এবং নিজ সঙ্গীসাথিদের সম্বোধন করে বলে,আল্লাহ্‌র কসম, আমরা মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত । খোদার কসম, মুসলমানদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে উসমানকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। কারণ, তাকে হত্যা করলে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এবং ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন জবাবদিহি করার কেউ থাকবে না- এসব সত্ত্বেও তাকে (রা.) হত্যা করা কোনভাবেই বৈধ নয়। অর্থাৎ আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায় এটি হলেও তাকে হত্যা করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। উক্ত ব্যক্তির এ কথাগুলি শুধুমাত্র তাদের আতঙ্কেরই প্রমাণ বহন করে না, বরং এই কথারও সাক্ষ্য বহন করছিল যে, হযরত উসমান (রা.) তখন পর্যন্ত কোন এমন বিষয় সৃষ্টি হতে দেন নি যেটিকে তারা কোন অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। তাদের হৃদয় অনুভব করছিল যে, হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা কোনক্রমেই বৈধ নয়।

যখন তারা হযরত উসমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম, যিনি অবিশ্বাসের যুগেও নিজ জাতিতে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং যাকে ইহুদিরা নিজেদের নেতা ও অতুলনীয় এক আলেম জ্ঞান করত; তিনি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া আরম্ভ করেন। তিনি তাদেরকে হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করতে বারণ করেন। তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা নির্বোধের মতো আল্লাহ্ তা'লার তরবারি নিজেদের ওপর টেনে এনো না। আল্লাহ্ র কসম, তোমরা যদি তরবারিকে আমন্ত্রণ জানাও, তবে এই তরবারি কখনো খাপে ঢুকানোর সুযোগ পাবে না। তখন মুসলমানদের মাঝে তরবারি নগ্নই থাকবে এবং মুসলমানদের মাঝে সবসময় মারামারি-হানাহানি লেগেই থাকবে। কিছুটা বিবেক খাটাও, এখন শাসন শুধুমাত্র চাবুকের মাধ্যমে করা হয়। অর্থাৎ সাধারণত, শরীয়তের বিধান লঙ্ঘনে চাবুকের শাস্তি প্রদান করা হয়। তোমরা যদি এই ব্যক্তিকে অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা কর, তবে তরবারি ছাড়া শাসনব্যবস্থা চলবে না। অর্থাৎ তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ অপরাধের শাস্তি হিসেবেও অপরাধীদের হত্যা করা হবে। স্মরণ রেখ, এখন মদিনার সুরক্ষায় ফেরেশতারা নিয়োজিত রয়েছে। যদি তোমরা তাকে হত্যা কর, তাহলে ফেরেশতারা মদিনা ছেড়ে চলে যাবে। এ নসীহতকে তারা যেভাবে ব্যবহার করেছে তা হলো, মহানবী (সা.)-এর সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.)-কে তারা তিরস্কার করে বিতাড়িত করে এবং তাকে তার পূর্বের ধর্মের খোটা দিয়ে বলে, হে ইহুদির সন্তান! এসব কাজের সাথে তোমার কী সম্পর্ক? পরিতাপ! একথা তাদের ঠিকই মনে ছিল যে, আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) ইহুদির সন্তান ছিলেন। কিন্তু তারা এটি ভুলে গেছে যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর হাতে ঈমান আনয়ন করেছেন এবং তার ঈমান আনার ফলে তিনি (সা.) অনেক আনন্দিত হন। তিনি প্রতিটি বিপদাপদ ও দুঃখকষ্টে মহানবী (সা.)-এর অংশীদার ছিলেন। অনুরূপভাবে তারা একথাও ভুলে গেছে যে, তাদের নেতা ও প্ররোচক, হযরত আলী (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর 'ওসী' আখ্যা দিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর মুখোমুখি দণ্ডায়মানকারী ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ বিন সাবাও ইহুদির সন্তান ছিল, বরং সে নিজে ইহুদি-ই ছিল আর শুধুমাত্র বাহ্যত মুসলমান হওয়ার ভান করছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) এসব কথা শুনে নিরাশ হয়ে তাদের কাছ থেকে চলে যান। অপরদিকে তারা যখন দেখে, দ্বারপথে গিয়ে হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করা কঠিন কাজ, কেননা এদিকে অল্প সংখ্যক লোক যারাই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তারা মরতে বা মারতে সদা প্রস্তুত ছিলেন, তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয়, কোন প্রতিবেশীর দেওয়াল টপকে গিয়ে হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করতে হবে। অতএব এই কুমতলব নিয়ে অল্প কয়েকজন লোক এক প্রতিবেশীর দেওয়াল টপকে তাঁর (রা.) কক্ষে প্রবেশ করে। তারা যখন ভিতরে প্রবেশ করে তখন হযরত উসমান (রা.) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। অবরুদ্ধ হওয়ার পর দিনরাত তাঁর ব্যস্ততা এটিই ছিল। অর্থাৎ তিনি হয় নামায পড়তেন, নয়তো পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর এছাড়া অন্য কোন কাজের প্রতিই তিনি মনোযোগ দিতেন না। সেই দিনগুলোতে তিনি কেবল একটিমাত্র কাজই করেছেন আর তা হলো এসব লোকের ঘরে প্রবেশের পূর্বে দুজন লোককে তিনি (রা.) ধনভাণ্ডারের সুরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। কেননা, যেভাবে এটি প্রমাণিত যে, সেদিন রাতে তিনি মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেন যে,তিনি (সা.) বলছেন, উসমান! আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার সাথে রোযা খুলবে। এই স্বপ্ন দেখার পর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আজ আমি শহীদ হয়ে যাব। তাই তিনি নিজের দায়িত্ব মনে করে দুজন লোককে আদেশ দেন যেন তারা ধনভাণ্ডারের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রহরা দেয়, যাতে হট্টোগোলের মাঝে কেউ ধনভাণ্ডার লুটে নেওয়ার চেষ্টা না করে। মোটকথা, ভেতরে প্রবেশের পর তারা দেখে যে, হযরত উসমান (রা.) কুরআন শরীফ পড়ছেন। এসব আক্রমণকারীদের মাঝে মুহাম্মদ বিন আবি বকরও ছিলেন আর তাদের ওপর বিদ্যমান তার প্রভাব ও ক্ষমতার কারণে তিনি একে নিজের দায়িত্ব জ্ঞান করতেন। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন, আবু বকর (রা.)-এর পুত্র হওয়ার সুবাদে আমি শ্রেষ্ঠত্ব রাখি, তাই আমার আবশ্যিক দায়িত্ব হলো সকল কাজে এগিয়ে থাকা। অতএব তিনি এগিয়ে গিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর দাড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান দেন। তার এহেন কাণ্ডে হযরত উসমান (রা.) শুধু এতটুকু বলেন যে, হে আমার ভাইয়ের পুত্র! এখন যদি তোমার পিতা, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) জীবিত থাকতেন তাহলে তুমি কখনোই এমনটি করতে না। তোমার কী হয়েছে? তুমি কি খোদার জন্য আমার প্রতি অসন্তুষ্ট? আমার প্রতি কি তোমার এছাড়া অন্য কোন রাগ রয়েছে যে, তোমাকে দিয়ে আমি খোদার প্রাপ্য প্রদান করিয়েছি? আমি কেবল এটিই বলি যে, খোদার প্রাপ্য প্রদান কর। একথা শুনে মুহাম্মদ বিন আবু বকর লজ্জিত হয়ে ফিরে যান, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সেখানেই অবস্থান করে। এছাড়া যেহেতু সে রাতেই বসরার সেনাবাহিনীর মদিনায় পৌঁছানোর নিশ্চিত সংবাদ এসে গিয়েছিল আর এ সুযোগই তাদের শেষ সুযোগ ছিল, তাই তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল যে, আমরা আমাদের কার্য সমাধা না করে ফিরে যাব না। অতএব তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে লোহার একটি রড দিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর মাথায় আঘাত করে এবং হযরত উসমান (রা.)-এর সামনে যে কুরআন শরীফটি খোলা ছিল সেটিকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। ফলে কুরআন শরীফটি গড়িয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে এসে যায় আর তাঁর মাথা থেকে রক্তের ফোটাগুলো তাতে গড়িয়ে পড়ে। কে আছে যে পবিত্র কুরআনের অসম্মান করতে পারে? কিন্তু উক্ত ঘটনার মাধ্যমে তাদের তাকওয়া ও বিশ্বস্ততার স্বরূপ খুব ভালোভাবে উন্মোচিত হয়ে গেছে। যে আয়াতের ওপর তাঁর রক্ত পড়ে তা একটি ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা নিজ সময়ে এমন মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে যে, চরম পাষাণ হৃদয়ের ব্যক্তিও সেই রক্তমাখা অক্ষরগুলোর ঝলক দেখে ভয়ে নিজের চোখ বন্ধ করে নিবে। সেই আয়াতটি হলো فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (সূরা বাকারা: ১৩৮) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাদের কাছ থেকে তোমার প্রতিশোধ নিবেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

এরপর সুদান নামের আরেক ব্যক্তি এগিয়ে এসে তাঁর ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। প্রথম আঘাত করলে তিনি (রা.) হাত দিয়ে তা প্রতিহত করেন, ফলে তাঁর হাত কেটে যায়। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন, খোদা তা'লার কসম! এটি সেই হাত যা সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ লিখেছিল। এরপর সে দ্বিতীয়বার আঘাত করে তাঁকে হত্যা করতে চাইলে তাঁর স্ত্রী নায়লা সেখানে আসেন এবং তাদের দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়ান, কিন্তু সেই পাষাণ একজন নারীকে আঘাত করতেও কুণ্ঠা বোধ করে নি, বরং সে আঘাত হেনেই ক্ষান্ত হয়। এর ফলে তাঁর স্ত্রীর আঙুল কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর সে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর আরেকটি আঘাত করে এবং তাঁকে গুরুতরভাবে আহত করে। আঘাতের যন্ত্রণায় যখন তিনি (রা.) অচেতন হয়ে পড়েছিলেন এবং প্রচণ্ড ব্যাথায় ছটফট করছিলেন, তখন সেই পাষণ্ড এটি ভেবে যে, এখনও তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয় নি, হয়ত প্রাণে বেঁচে যাবেন, তাঁর গলা চেপে ধরে টিপতে থাকে আর ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাঁর গলা ছাড়ে নি যতক্ষণ না তাঁর প্রাণ-পাখি জড়দেহ ছেড়ে উড়ে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করেছে। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।।** হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী প্রথমে আকস্মিক এই ঘটনার ভয়াবহতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কিছু বলতে পারেন নি, কিন্তু অবশেষে তিনি চিৎকার করেন। এতে দরজায় প্রহরারত লোকেরা ভিতরে ছুটে আসেন, কিন্তু তখন সাহায্যের কোন মূল্য ছিল না আর যা হওয়ার তা হয়ে গেয়েছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর একজন মুক্ত কৃতদাস সেই ঘাতক সুদানের হাতে রক্তে রঞ্জিত তরবারি দেখে আর সহ্য করতে পারেন নি, তাই সে সামনে এগিয়ে গিয়ে তরবারি দিয়ে সেই ব্যক্তির শিরোশ্ছেদ করে ফেলে। এটি দেখে তার সাথীদের এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে।

এখন ইসলামী রাষ্ট্রের সিংহাসন খলীফাশূন্য হয়ে গেছে। তাই মদিনাবাসী অধিক চেষ্টা করাকে বৃথা কাজ মনে করে আর সবাই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যায়। হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করার পর এসব লোক নিপীড়নের হাত গৃহের অন্যদের ওপরও প্রসারিত করতে শুরু করে। হযরত উসমান (রা.)-এর সহধর্মিণী সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রস্থানের সময় তাদের মধ্যে থেকে এক হতভাগা তাঁর সম্পর্কে তার দোসরদের কাছে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় মন্তব্য করে। একজন লজ্জাশীল মানুষের জন্য, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, একথা মেনে নেওয়াও নিঃসন্দেহে অসম্ভব যে, মহানবী (সা.)-এর একজন অন্যতম প্রবীণ-জ্যেষ্ঠ ও অগ্রণী সাহাবী, তাঁর জামাতা, গোটা মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিপতি, যুগ খলীফাকে তারা তখনই কেবল হত্যা করেছিল (এমতাবস্থায়) তারা এহেন নোংরা চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ করতে পারে! কিন্তু এদের নির্লজ্জতা এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, কোন কুকর্মই তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এরা কোন সদুদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়ায় নি আর তাদের দলটিও কোন পুণ্যবানদের দল ছিল না। তাদের মধ্যে কতিপয় লোক ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা ইহুদির প্রহসনের শিকার এবং তার ইসলাম-বিরোধী অদ্ভুত সব শিক্ষামালার ভক্ত। এছাড়া কতক ছিল কঠোর সমাজতন্ত্রবাদী বরং (বলা উচিত) বলশেভিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত। আর কিছু ছিল সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী, যারা তাদের দীর্ঘলালিত শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে চাইত। আবার কেউ কেউ ছিল দস্যু ও ডাকাত, যারা এই নৈরাজ্যের মাঝে নিজেদের উন্নতির পথ সন্ধান করত। অতএব তাদের নির্লজ্জতা বিস্মিত হওয়ার মতো কোন বিষয় নয়, বরং এরা যদি এমন আচরণ না করত তাহলে সেটিই ছিল আশ্চর্যের বিষয়। তারা যখন লুটপাট করছিল তখন আরেকজন মুক্ত কৃতদাস হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ির লোকদের চিৎকার ও আর্তনাদ শুনে সহ্য করতে পারে নি। তাই সে প্রথমে আক্রমণ করে সেই ব্যক্তিকে হত্যা করে যে প্রথম কৃতদাসকে হত্যা করেছিল। এজন্য তারা তাকেও হত্যা করে এবং মহিলাদের শরীর থেকেও অলংকারাদি খুলে নেয় আর হাসিঠাট্টা করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

(ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত আগায, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২৭-৩৩১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উক্ত হত্যাকারীদের বর্বরতার আরো বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, তারা নিজেরা কী করেছে? হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করেছে আর তিনি যখন রক্তের মাঝে ছটফট করছিলেন তখন হত্যাকারী হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করছিল। তার দেহ সম্পর্কে মন্তব্য করছিল। এরপর তারা এর চেয়েও জঘন্য কাজ করেছে, অর্থাৎ কেবল হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী-ই নয়, বরং তার চেয়েও তারা (আরো এক ধাপ) এগিয়ে গিয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কেও তারা নোংরামি করেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এসব কথা শোনার পর আমি এটিই বলব যে, খোদা তা'লা আমাকে অনেক বড় মর্যাদা দান করেছেন আর এজন্য আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু আমার মন চায়, হায়! আমি যদি এখনকার চেয়ে তখন থাকতাম তাহলে আমি তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম। তিনি (রা.) বলেন, তাদের চরম ধৃষ্টতা দেখুন? তারা হযরত আয়েশা (রা.)-কে তাঁর পর্দা সরিয়ে দেখার পর বলেছে, ইনি তো যুবতী।

(মজলিসে মুশাবিরাত, ১১ ও ১২ এপ্রিল, ১৯২৫- এর রিপোর্ট)

হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকেও বিরত হয় নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা থেকেও এটিই বুঝা যায় যে, এসব বিষয়ে তিনি কখনো ভীত হন নি, অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) এ বিষয়ে কখনো ভীত হন নি যে, আমার সাথে কী আচরণ করা হবে। ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত যে, মদিনার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর নামাযের পূর্বে বিদ্রোহীরা সকল মসজিদে ছড়িয়ে পড়ত এবং মদিনাবাসীকে পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখত যাতে তারা একত্রিত হয়ে তাদের মোকাবিলা করতে না পারে। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল ও নৈরাজ্য সত্ত্বেও হযরত উসমান (রা.) নামায পড়ার জন্য একাই মসজিদে যেতেন এবং সামান্য ভয়ও তিনি অনুভব করতেন না। ততদিন পর্যন্ত তিনি নিয়মিত আসতে থাকেন যতদিন না লোকেরা তাকে নিষেধ করেছে। যখন নৈরাজের মাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়িতে নৈরাজ্যবাদিরা আক্রমণ করে বসে, তখন সাহাবীদেরকে তিনি (রা.) নিজ গৃহের আশপাশে প্রহরায় নিয়োজিত না করে বরং তাদেরকে কসম দিয়ে বলেছেন, তারা যেন তাঁকে নিরাপত্তা দিতে গিয়ে নিজেদের জীবনকে বিপদের মুখে না ফেলে, এবং নিজেদের বাড়ি ফিরে যায়। যে ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করতে ভয় পায়, সে কি এমনটি করতে পারে আর মানুষকে একথা বলতে পারে যে, আমার কথা চিন্তা করো না, বরং নিজ নিজ গৃহে চলে যাও! এটি প্রমাণিত যে, শাহাদাত বরণের ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.)-এর কোন ভীতি ছিল না। যেভাবে খুতবার শুরুতেই বলা হয়েছে যে, এসব ঘটনায় হযরত উসমান যে বিন্দুমাত্রও ভীত ছিলেন না; এর আরেকটি জোরালো প্রমাণ হলো, এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে আসেন এবং সিরিয়ায় ফেরৎ যাওয়ার সময় মদীনাতে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করেন, আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন, সেখানে আপনি এসব নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকবেন। তখন তিনি (রা.) বলেন, হে মুয়াবিয়া! আমি রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর সান্নিধ্যের ওপর অন্য কিছুকেই প্রাধান্য দিতে পারি না। এ প্রেক্ষিতে তিনি নিবেদন করেন, আপনি যদি (আমার) একথা মানতে রাজি না থাকেন তাহলে আমি সিরিয়ান সেনাবাহিনীর একটি দল আপনার নিরাপত্তার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। হযরত উসমান (রা.) বলেন, নিজের নিরাপত্তার জন্য একটি সেনাদল রেখে মুসলমানদের রিযিক আমি সংকুচিত করতে চাই না। এতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! মানুষ আপনাকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করবে, অথবা আপনার বিরুদ্ধে তারা রীতিমতো যুদ্ধও আরম্ভ করতে পারে। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না। আমার জন্য আমার খোদাই যথেষ্ট। অবশেষে তিনি বলেন, আপনি যদি অন্য কিছুর অনুমোদন না দেন তাহলে কমপক্ষে এতটুকু করুন যে, দুষ্ট লোকেরা যেসব জ্যেষ্ঠ সাহাবী সম্পর্কে দম্ভ ভরে মনে করে যে, আপনার পর তারা সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদন করতে পারবে আর তাদের নাম নিয়ে নিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে, আপনি তাদের সবাইকে মদিনা থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিন এবং বাহিরের দেশ সমূহে ছড়িয়ে দিন। এতে দুষ্টদের চক্রান্ত দুর্বল হয়ে যাবে আর তারা ভাববে, আপনার সাথে বিবাদ করে তাদের কী লাভ যেখানে মদিনায় দায়িত্ব গ্রহণের মতো আর কেউ-ই নেই! কিন্তু হযরত উসমান এই প্রস্তাবও গ্রহণ করেন নি, (পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে) এবং বলেন এটি কীভাবে হতে পারে যে, যাদেরকে মহানবী (সা.) একত্রিত করেছেন, আমি তাদেরকে দেশান্তরিত করব। হযরত মুআবিয়া একথা শুনে কেঁদে ফেলেন এবং নিবেদন করেন, আপনি যদি আর কিছু না-ই করেন তাহলে এতটুকুই ঘোষণা করে দিন যে, আমার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে মুআবিয়া। তিনি বলেন, হে মুআবিয়া! তোমার প্রকৃতি কঠোর। আমি ভয় পাই যে, তুমি আবার কোথাও মুসলমানদের প্রতি কঠোরতা না কর। তাই আমি এই ঘোষণাও করতে পারব না। বলা হয়ে থাকে যে, হযরত উসমান দুর্বলচিত্ত ছিলেন। কিন্তু তোমরা নিজেরাই বল, এরূপ সাহসিকতা কতজন দেখাতে পারবে? উক্ত ঘটনাবলীর বর্তমানে কি একথা বলা যেতে পারে যে, তাঁর হৃদয়ে কোন ভীতি ছিল? অর্থাৎ হযরত উসমানের হৃদয়ে কোন ভীতি ছিল? যদি ভয় থাকত তাহলে তিনি বলতেন, তুমি তোমার সেনাবাহিনীর একটি দল আমার সুরক্ষার জন্য পাঠিয়ে দাও। তাদের বেতনভাতার ব্যবস্থা আমি করব। যদি ভয় থাকত তাহলে তিনি ঘোষণা করতেন যে, আমার ওপর যদি কেউ হাত উঠায় তাহলে সে জেনে রাখুক আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে মুআবিয়া। কিন্তু তিনি এছাড়া আর কোন উত্তর দেন নি যে, হে মুআবিয়া! তোমার প্রকৃতি কঠোর, আমি ভয় পাই যে, আমি যদি তোমাকে এই অধিকার প্রদান করি তাহলে তুমি মুসলমানদের প্রতি কঠোরতা করবে। অবশেষে যখন শত্রুরা দেওয়াল টপকে তাঁর ওপর আক্রমণ করে তখন কোন ভয় বা ভীতি প্রদর্শন না করে তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ করতে থাকেন। একপর্যায়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর এক পুত্র, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি করুণা করুন, অগ্রসর হয় এবং হযরত উসমান (রা.)-এর শ্মশ্রু ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দেয়। হযরত উসমান তার দিকে চোখ তুলে তাকান এবং বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এখন যদি তোমার পিতা জীবিত থাকতেন তাহলে তুমি কখনো এরূপ করতে না। একথা শুনতেই তার আপাদমস্তক কেঁপে উঠে এবং সে লজ্জিত হয়ে ফিরে যায়। এরপর অপর এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে এবং সে একটি লোহার শিক দিয়ে, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসমানের মাথায় আঘাত করে আর সামনে যে কুরআন রাখা ছিল, সেটিকে পা দিয়ে লাথি মেরে ফেলে দেয়। সে সরে গেলে অপর এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে এবং তরবারি দ্বারা তাঁকে (রা.) শহীদ করে। এসব ঘটনা দৃষ্টে কে বলতে পারে যে, হযরত উসমান (রা.) এসব ঘটনায় ভীত ছিলেন।

( খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৫৩৬-৫৩৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন হয়েছে, আর তিনি সেভাবেই আগমন করেছেন যেভাবে হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান এবং অন্যান্য নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তাঁর পরও সেভাবেই খিলাফতের ধারা আরম্ভ হয়েছে যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের পর খিলাফতের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা যদি বিবেকের চোখে দেখি এবং এর বাস্তবতাকে অনুধাবনের চেষ্টা করি তাহলে আমরা জানতে পারব যে, এটি এক মহান ব্যবস্থা। অর্থাৎ খিলাফত ব্যবস্থা এক মহান ধারা। বরং আমি বলব, যদি দশ হাজার প্রজন্মও এর প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ করা হয় তথাপি তা কোন মূল্য রাখে না। আমি অন্যদের সম্পর্কে জানি না, কিন্তু অন্ততপক্ষে নিজের সম্পর্কে জানি যে, মহানবী (সা.)-এর যুগের ইতিহাস পাঠের পর আমি যখন হযরত উসমানের ওপর আপতিত বিপদাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিই আর অপরদিকে সেই জ্যোতি ও আধ্যাত্মিকতাকে দেখি, যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এসে তাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন, তখন আমি বলব, পৃথিবীতে যদি আমার দশ হাজার বংশধর জন্ম নেওয়ার হতো, আর সেই নৈরাজ্য দূরীভূত করার জন্য তাদের সবাইকে একত্রিত করে উৎসর্গ করে দেওয়া হতো, তাহলে আমি মনে করি এটি উকুনের বিনিময়ে হাতি ক্রয় করার মতো ব্যবসা। অর্থাৎ উকুনের ন্যায় অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে অতি মূল্যবান জিনিস অর্থাৎ হাতি ক্রয় করার মতো একটি বিষয়, বরং তার চেয়েও লাভজনক বিনিময়। আসল কথা হলো, কোন জিনিসের মূল্য কী- তা আমরা পরে অনুধাবন করে থাকি।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ:২৪৬)

অর্থাৎ পরবর্তীতে বোঝা যায় যে, প্রকৃত মূল্য কী। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর বোঝা গিয়েছিল যে, খিলাফতের গুরুত্ব কতটা? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর তিরোধানের পর খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার জন্য হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি সকল সাহাবীর (রা.) দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। জ্যেষ্ঠ সাহাবাদের পরামর্শে তিনি এ কাজের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি মহানবী (সা.)-এর জামাতা ছিলেন আর একাধারে তাঁর (সা.) দুই কন্যাকে তার সাথেই বিয়ে দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) -এর দ্বিতীয় কন্যা যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, আমার যদি আরো কোন মেয়ে থাকত তাহলে তাকেও আমি হযরত উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম। এ থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে তিনি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মক্কাবাসীদের দৃষ্টিতে তিনি বিশিষ্ট মর্যাদা রাখতেন এবং তৎকালীন আরবের সমাজ ব্যবস্থায় বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) মুসলমান হওয়ার পর যে কয়জন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত উসমান। আর তাঁর সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ধারণা ভুল ছিল না, বরং স্বল্প কয়েক দিনের তবলীগেই হযরত উসমান (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আর এভাবে তিনি ***'আস সাবেকুনাল আওয়ালুন'*** অর্থাৎ- ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হন যাদের প্রশংসা পবিত্র কুরআনে অতি ঈর্ষণীয় ভাষায় করা হয়েছে। আরবে তিনি কতটা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তার কিছুটা ধারণা এ ঘটনা হতে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) যখন একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে মক্কায় আগমন করেন আর মক্কাবাসীরা বিদ্বেষ ও শত্রুতায় অন্ধ হয়ে তাঁকে (সা.) উমরা করার অনুমতি দেয় নি, তখন মহানবী (সা.) প্রস্তাব রাখেন যে, কোন বিশেষ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে মক্কাবাসীদের নিকট এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হোক এবং এ কাজের জন্য তিনি হযরত উমর (রা.)-কে মনোনীত করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি যেতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মক্কায় যদি কেউ তাদের সাথে আলোচনা করতে পারে তবে তিনি হলেন হযরত উসমান (রা.), কেননা তিনি মানুষের দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। অতএব যদি অন্য কেউ যায় তাহলে এতে ততটা সফলতার আশা করা যায় না যতটা হযরত উসমান (রা.)-এর ক্ষেত্রে করা যায়। আর তাঁর এই কথাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ও সঠিক বলে মেনে নেন এবং তাঁকেই উক্ত কাজের জন্য প্রেরণ করেন। এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত উসমান (রা.) কাফেরদের দৃষ্টিতেও বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

মহানবী (সা.) তাকে অনেক সম্মান করতেন। একবার তিনি (সা.) শুয়ে ছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) আসেন। তিনি (সা.) সেভাবেই শুয়ে থাকেন। এরপর হযরত উমর (রা.) আসেন। তখনও তিনি (সা.) সেভাবেই শুয়ে থাকেন। তারপর হযরত উসমান (রা.) আসলে তিনি (সা.) দ্রুত নিজের কাপড় গুছিয়ে নেন আর বলেন, হযরত উসমান (রা.) -এর প্রকৃতিতে লজ্জাশীলতা অনেক বেশি, তাই আমি তার আবেগ-অনুভূতির কথা চিন্তা করে এরূপ করি। তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) সেই বিরল ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেও কখনো মদ পান করেন নি এবং ব্যাভিচারের ধারেকাছেও যান নি। এগুলো এমন বৈশিষ্ট্য, যা আরবের মতো দেশে ইসলাম ধর্মের পূর্বে গুটিকতক ব্যক্তি ছাড়া (কারো মাঝে) খুব একটা দেখা যেতো না, যেখানে মদ পান করা গর্বের বিষয় আর ব্যাভিচারকে নিত্যনৈমিত্তিক স্বাভাবিক বিষয় মনে করা হতে। মোটকথা তিনি (রা.) কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, বরং অতি উন্নত মানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। জাগতিক সম্মানের দিক থেকেও তিনি (রা.) অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁর (রা.) প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আর হযরত উমর (রা.) তাঁকে সেই ছয় ব্যক্তির একজন আখ্যায়িত করেছেন যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর উচ্চ পর্যায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া তিনি (রা.) 'আশারায়ে মুবাশ্বেরা'-র একজন ছিলেন, অর্থাৎ সেই দশব্যক্তির একজন, যাদেরকে মহানবী (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।"

(ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫১-২৫৩)

হযরত উসমানের শাহাদাতের দিন সম্পর্কে বলা হয় যে, হযরত উসমান (রা.) ১৭ অথবা ১৮ যুলহজ্জ তারিখে ৩৫ হিজরী সনে জুমুআর দিন শহীদ হন। আবু উসমান নাহদী-র মতে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত তাশরীক-এর দিনগুলোর মধ্যম দিনে হয়েছিল; অর্থাৎ ১২ যুলহজ্জ তারিখে। অপরদিকে ইবনে ইসহাকের মতে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার এগারো বছর এগারো মাস বাইশ দিন পর এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর তিরোধানের পঁচিশ বছর পর ঘটেছিল।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৯)

অপর একটি বর্ণনা অনুসারে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন উসমান বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রা.) জুমুআর দিন ১৮ যুলহজ্জ তারিখে ৩৬ হিজরী সনে আসরের নামাযের পর বিরাশি বছর বয়সে শাহাদাত লাভ করেন। শাহাদাতের সময় তিনি (রা.) রোযাদার ছিলেন। আবু মা'শার-এর মতে শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় ভাগ, পৃ: ৪৩)

হযরত উসমান (রা.)-এর কাফন-দাফন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, নিয়ার বিন মুকরাম বলেন, শনিবার রাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে আমরা চার ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.)-এর মরদেহ বহন করি। অর্থাৎ আমি, যুবায়ের বিন মুতআম, হাকীম বিন হিযাম এবং আবু জু হুম বিন হুযায়ফা। হযরত যুবায়ের বিন মুতআম তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মুয়াবিয়া এর সত্যায়ন করেছেন। উক্ত চারজনই তাঁর কবরে নেমেছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যুবায়ের বিন মুতআম ষোলজন ব্যক্তিকে নিয়ে হযরত উসমান (রা.) এর জানাযা পড়িয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ এর ভাষ্য হলো, প্রথম রেওয়ায়েতটি বেশি সঠিক। অর্থাৎ চার ব্যক্তি সম্পর্কিত রেওয়ায়েত; যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, চার ব্যক্তি তাঁর জানাযার নামায পড়েছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় ভাগ, পৃ: ৪৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন উসমান বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.)-কে শনিবার রাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে 'হাশ-এ-কাওকাব' এ দাফন করা হয়। রবী' বিন মালেক নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তারা নিজেদের মৃতদেরকে 'হাশ-এ-কাওকাব' এ দাফন করবে। 'হাশ' ছোট বাগানকে বলা হয় আর 'কাওকাব' ছিল একজন আনসারী-র নাম, যিনি উক্ত বাগানের মালিক ছিলেন। এটি জান্নাতুল বাকী-র অতি নিকটবর্তী একটি স্থান ছিল। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বলতেন, শীঘ্রই একজন পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এবং তাকে সেখানে দাফন করা হবে; অর্থাৎ 'হাশ-এ-কাওকাব'-এ দাফন করা হবে, আর মানুষ তার অনুসরণ করবে। মালেক বিন আবু আমের বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যাকে সেখানে দাফন করা হয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় ভাগ, পৃ: ৪২-৪৩)

হযরত উসমান (রা.)-এর দাফন সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত এটিও পাওয়া যায় যে, নৈরাজ্যবাদী ও বিদ্রোহীরা তিনদিন পর্যন্ত তাঁর লাশ দাফন করতে দেয় নি। অতএব তাবরীর ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে, আবু বশীর আবেদী বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.)-এর মরদেহ তিনদিন পর্যন্ত কাফন-দাফনবিহীন ছিল এবং তাঁর দাফনকার্য সম্পন্ন করতে দেওয়া হয় নি। এরপর হযরত হাকীম বিন হিযাম ও হযরত জুবায়ের বিন মুতআম হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর দাফনের ব্যাপারে কথা বলেন, যেন তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর পরিবারের নিকট তাঁর দাফনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতএব হযরত আলী (রা.) তা-ই করেন আর তারা হযরত আলী (রা)-কে অনুমতি প্রদান করেন। যখন তারা অর্থাৎ বিদ্রোহীরা এ কথা জানতে পারে তখন তারা পাথর নিয়ে রাস্তায় বসে পড়ে। এদিকে হযরত উসমান (রা.)-এর জানাযার সাথে তার পরিবারের কয়েকজন বের হয়। তারা মদিনায় একটি বেড়াঘেরা স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা রাখতেন যাকে 'হাশ-এ-কাওকাব' বলা হতো। ইহুদিরা সেখানে নিজেদের মৃতদের দাফন করত। হযরত উসমান (রা.)-এর জানাযা যখন বাইরে আসে তখন তারা (অর্থাৎ বিদ্রোহীরা) তাঁর খাটিয়াতে পাথর ছুঁড়তে থাকে আর তাঁকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। যখন হযরত আলী (রা.)-এর কাছে উক্ত সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি তাদের প্রতি বার্তা প্রেরণ করেন যেন তারা এমন করা থেকে বিরত হয়। এতে তারা বিরত হয়। অতঃপর জানাযা যাত্রা করে। অবশেষে হযরত উসমান (রা.)-কে 'হাশ-এ-কাওকাব'-এ দাফন করা হয়। আমীর মুআবিয়া যখন মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন তখন তিনি আদেশ দেন যেন এ ঘেরা দেওয়া স্থানের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হয়, যাতে তা জান্নাতুল বাকী-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর তিনি মানুষকে আদেশ দেন যেন তারা তাদের মৃত ব্যক্তিদের হযরত উসমান (রা.)-এর কবরের চারপাশে

দাফন করে। এর ফলে সেই অঞ্চল মুসলমানদের কবরস্থানের সাথে গিয়ে একীভূত হয়ে যায়।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৮৭)

ইতিহাসের কতক গ্রন্থে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সেই জায়গা স্বয়ং হযরত উসমান (রা.) ক্রয় করে জান্নাতুল বাকী-র সাথে যুক্ত করেছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৫৮৬)

যাহোক স্মৃতিচারণের কিছু অংশ এখনও বাকি আছে যা আগামীতে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। আজ আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির জানাযার নামাযও পড়াব, তাই এখন তাদেরও স্মৃতিচারণ করছি। প্রথমে যার স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে তিনি হলেন, মৌলভী মু হাম্মদ ইদ্রিস তেরো সাহেব, মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ আইভরি কোস্ট- যিনি কয়েকদিনের অসুস্থ তার পর গত ২৭ ও ২৮ তারিখের মধ্যরাতে মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । তিনি আইভরি কোস্টের নাগরিক ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি বুরকিনাফাসো চলে যান। জাগতিক পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি আরবী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ষাটের দশকে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পাকিস্তানে চলে যান আর সেখানে জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা সমাপনান্তে আইভরি কোস্টে মুবাল্লেগ হিসেবে সিলসিলাহ্র সেবা করারসৌভাগ্য লাভ করেন। প্রথমে ঘানা এবং পরবর্তীতে বুরকিনাফাসোতে দায়িত্ব পালনের পর পুনরায় ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আইভরি কোস্টে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন।

পাকিস্তান যাওয়ার যে ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন তা খুবই চিত্তাকর্ষক। তাঁর কাছে সঞ্চিত অর্থ -কড়ি যা-ই ছিল, তা দিয়ে তিনি প্লেনের টিকিট ক্রয় করেন আর কাউকে কিছু না জানিয়ে পাকিস্তানে পেঁ ৗছে যান, অর্থাৎ আইভরি কোস্ট জামা'তকেও বলেন নি আর পাকিস্তানের কাউকেও অবগত করেন নি। পাকিস্তানে পেঁ ৗছে এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। হঠাৎ দেখেন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছে যান, বরং সেই ব্যক্তি স্বয়ং তাঁর কাছে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন আর কোথায় যাবেন? তিনি ইংরেজী ভাষা জানতেন না আর উ র্দু ও জানতেন না, দু'একটি আরবী বাক্যে কথা হয়। যাহোক, তিনি তাকে আহমদীয়া হলে নিয়ে আসেন। এরপর সেই ব্যক্তি বলেন, আমার স্ত্রী রাতে স্বপ্নে দেখেছে যে, একজন ভিনদেশী অতিথি এসেছে আর আপনি তাকে নিয়ে এসেছেন। তাই (স্ত্রীর স্বপ্নের প্রেক্ষিতে) আমি এয়ারপোর্টে এসেছি আর যখন দেখলাম উড়োজাহাজ থেকে বেরিয়ে কেবল আপনিই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন আমি বুঝে গেলাম, ইনিই সেই অতিথি যাকে আমার স্ত্রী স্বপ্নে দেখেছেন। অতএব এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (রাবওয়াতে আসার) জন্য বন্দোবস্ত করে দেন। এই ঘটনাটি তিনি প্রায়ই শুনাতেন আর বলতেন যে, আমি সারা পথ দোয়া করতে থাকি আর তখনও আমি দোয়ায় রত ছিলাম। এটি দোয়া কবুলিয়্যতের নিদর্শন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সকল ব্যবস্থা নিজেই করেছেন আর এক রাত পূর্বে করাচিতে বসবাসরত ঐ আহমদী ব্যক্তির স্ত্রীকেও স্বপ্ন দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমি আসছি। অতএব এভাবে তার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। অতঃপর তিনি আহমদীয়া হলে পৌঁছে যান আর পরবর্তীতে রাবওয়া পৌঁছেন। মোটকথা তিনি খুবই পুণ্যবান এবং দোয়াগো ব্যক্তি ছিলেন।

আইভরি কোস্টের মিশনারী ইনচার্য জনাব কাইয়ুম পাশা সাহেব জানিয়েছেন যে, বুরকিনাফাসোতে আমরা একসাথে তিন বছর কাজ করেছি। এছাড়া আইভরি কোস্টেও একত্রে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। জামা'তের প্রতি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তিনি অশেষ ভালোবাসা রাখতেন। খুবই আত্মত্যাগী, ইবাদতকারী মানুষ ছিলেন। উদার মনের অধিকারী ছিলেন এবং মানুষকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করতেন। অন্যের শিশুদেরনিজ ঘরে রেখে তাদের পড়াশুনা এবং অন্যান্য ব্য য়ভার বহন করতেন। ধর্ম সেবার ক্ষেত্রে সর্বদা সম্মুখ সারিতে থাকতেন। অতিথি আপ্যায়ন তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ পরিচিতি ছিল। তবলীগের রীতিও অতি চমৎকার ছিল আর গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এছাড়া মানুষ তাঁর তবলীগ পছন্দ করত। যেখানেই তবলীগের উদ্দেশ্যে বসতেন সেখানেই তাঁর আশপাশে মানুষের ভিড় জমে যেত। তিনি তাহাজ্জুদ গুযার এবং সত্য স্বপ্নদর্শী ও নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন।

আইভরি কোস্টের মুয়াল্লেম সিদ্দিক জিয়ালু সাহেব বলেন, মৌলভী ইদ্রিস তেরো সাহেব জামা'ত এবং খিলাফতের জন্য দিওয়ানা ছিলেন যিনি সদা-সর্বদা জামাতের স্বার্থে সবরকম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। তিনি বলেন, আমি আইভরি কোস্টে আর কোন ব্যক্তিকে তার চেয়ে বেশি জামা'তকে ভালোবাসতে দেখিনি। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হতো, আপনি কোন দেশের নাগরিক? তখন উত্তরে বলতেন, আমি আফ্রিকানও নই, ইউরোপিয়ানও নই, অন্য কোন দেশের নাগরিকও নই; আমার জাতীয়তা, আমার পরিচয় ও আমার জাতি হলো আহমদীয়াত! তিনি আইভরি কোস্টের প্রারম্ভিক আহমদীদের মাঝে অন্যতম ছিলেন।

আইভরি কোস্টের মুবাল্লেগ বাসেত সাহেব লিখেন, সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জোরালো নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, আমি যে কল্যাণই লাভ করেছি, তা খিলাফতের বদৌলতেই লাভ করেছি। জ্ঞানের দিক থেকেও অনেক উচ্চ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। তার মাতৃভাষা 'জুলা' ছাড়াও ফ্রেঞ্চ, আরবী ও উর্দু ভাষায়ও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা রাখতেন। ধর্মশাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ ও তার্কিক ছিলেন। ওয়াহাবী আলেমদের সাথে (ধর্মীয়) বিতর্ক করতেন। সান পেদ্রোতে সংঘটিত (এমনই) একটি বিতর্কের ঘটনা একজন আহমদী ভাই আব্দুল্লাহ্ সাহেব শুনিয়েছেন যে, ওয়াহাবী মসজিদে আসেন এবং বিতর্কের জন্য শর্ত নির্ধারিত হয় যে, যুক্তি-প্রমাণ কেবল কুরআন থেকে উপস্থাপন করতে হবে। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত একনাগাড়ে বিতর্ক চলতে থাকে, যার মধ্যে কেবল নামাযের বিরতি দেয়া হয়। বিতর্ক চলাকালে মৌলভী (ইদ্রিস) সাহেব বিরুদ্ধপক্ষের মৌলভী সাহেবের সামনে এমন যুক্তি উপস্থাপন করেন, যার কোন খণ্ডন সেই মৌলভী উপস্থাপন করতে পারেন নি এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেয়; আর সেই বিতর্কে আহমদীয়াত বিজয় লাভ করে। তিনি আরও লিখেন, তার অবস্থা ছিল লাইব্রেরির মতো; তবলীগের ময়দানে বিভিন্ন রেফারেন্স তার মুখস্থথাকত, আর সেই রেফারেন্স উর্দু, আরবী বা ফ্রেঞ্চ- যে ভা ষাতেই হোক, তিনি ঝটপট শুনিয়ে দিতেন। সবসময় দোয়াকে নিজের অস্ত্ররূপে ধারণ করতেন এবং সবাইকে দোয়া করার উপদেশও প্রদান করতেন।

তার একজন স্ত্রী, চার কন্যা ও এক পুত্র রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তানদেরও জামা'তের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সক্রিয় করুন এবং তার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে তাদেরকে জামাতের অঙ্গীভূত করুন। জামা'তের সাথে তাদের খুব একটা সম্পর্ক নেই, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিও ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো মোকাররমা আমিনা নায়েগা কায়রে সাহেবার, যিনি উগান্ডার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মুহাম্মদ আলী কা য়রে সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন; গত ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । একজন বিনয়ী, শিক্ষিত ও সাহসী নারী ছিলেন। তার স্বামী কায়রে সাহেব বলেন, আমার সফল মুরব্বী হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ কারণ আমার স্ত্রীও বটে। জাতীয়তায় উগান্ডান হলেও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স ছিল উনিশ বছর। তিনি তখন কুরআন শরীফ পড়তে পারতেন না; কিন্তু যেহেতু এর জন্য তার মাঝে স্পৃহা ও একাগ্রতা ছিল, তাই তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শিখে ফেলেন এবং এর অর্থে অভিনিবেশ করার চেষ্টা করতেন। বিভিন্ন পদে থেকে তিনি জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০০৫ সালে তাকে সদর লাজনা নিযুক্ত করা হয়। তবলীগের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। দু'একবার বিনা অপরাধে তাকে কারাবরণও করতে হয়েছে; অর্থাৎ তিনি কোন অপরাধ করেন নি, অন্যায়ভাবে তাকে কারাবরণে বাধ্য করা হয়। তরবিয়তী বিষয়াদিতে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অ -আহমদীদের আপত্তিসমূহের উত্তর দিতেন। তার মেয়ে বলেন, তিনি সুস্থ থাকুন বা অসুস্থ হোন- সর্বাবস্থায় যথাযথ ভাবে নামায আদায় করতেন। প্রত্যেক বছর রমজান মাসে ই'তিকাফে বসতেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ সহ্য করতেন, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে কোন কিছু সহ্য করতেন না। রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন পর্যায়েও তিনি কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমা ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও ছয় সন্তান রেখে গিয়েছেন, যাদের মধ্যে দুই পুত্র মিশনারী।

পরবর্তী জানাযা সিরিয়ার মোকাররম লুইয়ী কাযাক সাহেবের, যিনি গত ১০ ডিসেম্বর তারিখে আটচল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে ১৯২৮ সালে (ঠিক তখন) যখন মওলানা জালালুদ্দীন শাম্স সাহেব দামেস্ক থেকে হায়ফা গিয়েছিলেন। হায়ফার প্রথম আহমদী মোকাররম রশিদ বাকিস বুসতি সাহেবের তবলীগে মরহুমের প্রপিতামহ আলী সালেহ্ কাযক সাহেব এবং তার ভাই জর্দানের প্রাক্তন আমীর তাহা কাযক সাহেবের পিতা মুহম্মদ কাযক সাহেব তাদের পরিবারসহ বয়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাদের পরিবার হিজরত করে দামেস্ক চলে যায়। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। নিয়মিত রোযা রাখতেন এবং নামাযী ছিলেন। নিয়মিত চাঁদাদাতা এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা রাখতেন। জামা'তের কাজে অগ্রগামী থাকতেন এবং নিজের দারিদ্রতা সত্ত্বেও অন্যদের আর্থিক সাহায্য করতেন। অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। মরহুম তার শোক সন্তপ্ত পরিবারে দুই স্ত্রী এবং তিনজন নাবালিকা (কন্যা) রেখে গিয়েছেন, যার মধ্যে দুই জন ওয়াকফে-নও।

জামা'তের প্রেসিডেন্ট ওয়াসীম মুহাম্মদ সাহেব লিখেন, তার দায়িত্ব ছিল বিশেষত অসুস্থ ও আহতদের হাসপাতালে পৌঁছানো। সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতেও যখনই তাকে কাজের কথা বলা হতো, তিনি খুবই সাহসিকতার সাথে কাজ করতেন। একইভাবে মজলিসে আমেলার সদস্যদের সফরে নিয়ে যেতেন। তাকে গাড়ি দেওয়া হয়েছিল, (যার মাধ্যমে) তিনি এই কাজ করতেন। যখনই বলা হতো, তৎক্ষনাৎ পেঁ ৗছে যেতেন এবং হাস্যবদনে সেবা করতেন। আন্তরিক উদ্দীপনার সাথে সকল কাজ করতেন। নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন আর শেষ কয়েক বছর এই অভ্যাস আরো সুদৃঢ় হয়েছিল। আহমদীদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। তিনি লিখেন, সরলতা, স্বল্পভাষিতা, নিষ্ঠা,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 22 April, 2021 Issue No.16

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মানবসেবা এবং নিয়্যতের স্বচ্ছতার নিরিখে মরহুম সবার ওপর উত্তম প্রভাব রেখে গিয়েছেন।

মরহুমের স্ত্রী খাদিজা আলী সাহেবা লিখেন, আমার স্বামী আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। জামা'তের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। জনসেবামূলক কাজ তার খুব পছন্দ ছিল। ঘরের কাজে আমাকে সাহায্য করতেন। নিজ কন্যাদের অনেক ভালোবাসতেন এবং তাদের উত্তম তরবিয়তের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তাদের সাথে বসে দীর্ঘ ক্ষণ জামা'তের ব্যাপারে কথা বলতেন। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে তিনি তার শেষ সময়টাও জামা'তের সেবায় অতিবাহিত করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন।

তার খালাতো ভাই আকরাম সালমান সাহেব, যিনি মরহুমের মাধ্যমে বয়আত করেছিলেন, তিনি লিখেন, আমরা বয়আতের পূর্বে ও মরহুমের উত্তম চরিত্রের সাক্ষী ছিলাম। তার নিজেরই আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি তার দরিদ্র আত্মীয়দের সাহায্য করতেন। তিনি বলেন একটি ঘটনা, যা আমার হৃদয়ে দাগ কেটেছিল, তা হলো, একবার তিনি অনেক ভালো একটি চাকরি পান। যার মাধ্যমে তার সকল ধার পরিশোধ হয়ে যায়। এরপর তিনি সঞ্চয় করার পরিবর্তে আমার দরিদ্র খালাদের বড় অংকের অর্থ দান করে দেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, যেহেতু আমার স্বাস্থ্য ভালো আছে এবং আমার ওপর কোন ঋণের বোঝা নেই, অতএব আমি ধনী। তাই আমি আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্র দের দান করতে চাই আর দান করাই উচিত। এই কথা আমার কাছে বিস্ময়কর ছিল, কে ননা আমি আমার জীবনে এরূপ স্বল্পে তুষ্টি এবং আর্থিক কুরবানীর এই মান কারো মাঝে দেখি নি। তিনি বলেন, আমাদের দুই ভাইয়ের বয়াতের পর আমাদের তালিম, তরবিয়ত এবং খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। আমাদের খিলাফতের বরকত সমৃদ্ধ ঈমানোদ্দিপক ঘটনা শুনাতেন। যার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। মরহুমের ভাই মু 'তায কাযাক সাহেব, যিনি জামেয়া আহমদীয়া কানাডার শিক্ষক,তিনি লিখেন, আমার মরহুম ভাই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং খিলাফতের প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। যদিও আমাদের পূর্ব -পুরুষ আহমদী ছিলেন, কিন্তু আমরা আহমদীয়াত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমার ভাই খিযির কাযাক সাহেবের জানাযায় অংশ নিতে হালব থেকে দামেস্ক যান, যেখানে কিছু আহমদী ভাইয়ের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় আর জামা'তের বিষয়ে তার মতবিনিময় হয়। ফিরে আসার পর আমি দেখেছি, তিনি সিজদায় অনেক বেশি কাঁদতেন। এই আকস্মিকপরিবর্তন আমার কাছে বিস্ময়কর লাগছিল। আমি যখন এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করি, তিনি তখন আমাকে জামা'তের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, এরপর আমি গবেষণা আরম্ভ করি। শুরুতে আমি কেবল নামসর্বস্ব আহমদী ছিলাম। এরপর নিয়মিত জামা'তের শিক্ষা সম্পর্কে পড়ালেখা আরম্ভ করি এবং একটি স্বপ্ন দেখার পর আমি পুনরায় বয়আত করি। আমার বয়আতের ক্ষেত্রে আমার ভাইয়ের নেক পরিবর্তন গুরু ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। দ্বিতীয়বার বয়আতের অর্থা হলো তাদের বংশে শুরু থেকেই প্রথাগত আহমদীয়াত চলে আসছিল , কিন্তু কার্যত তারা আহমদী ছিলেন না। এজন্য তিনি বুঝার পর পুনরায় বয়আত করেন। মরহুম তবলীগ-পাগল মানুষ ছিলেন। যুগ-খলীফার জন্য অনেক দোয়া করতেন। ওসীয়্যতকারী ছিলেন। মরহুম মৃত্যুর পূর্বেই তার মৃত্যু আসন্ন বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বেই তার মা এবং স্ত্রীদের কাছে এর উল্লেখ করেছিলেন।

পরবতী জানাযা রাবওয়া নিবাসী মোকাররমা ফরহাত নাসিম সাহেবার- যিনি মোকাররম মুহম্মদ ইব্র াহীম হানিফ ওরফে মাস্টার চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ২৬ ডিসেম্বর তারিখে৮৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । মরহুমার পিতা গুরুদাসপুর জেলার লোধী নাঙ্গাল নিবাসী হযরত মিয়া ইলম দ্বীন সাহেব এবং দাদা হযরত মিয়া কুতুবুদ্দিন সাহেবছিলেন। তারা মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন।

মরহুমা অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারীছিলেন। নিয়মিত নামায আদায়কারী, রোযাদার, তাহাজ্জুদগুযার, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, দোয়াগো, সরল প্রকৃতির এবং খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবান নারী ছিলেন। বিভিন্ন চাঁদার তাহরীকে তিনি সাধ্যমত অংশ নিতেন। বেশ কয়েকবার বিভিন্ন তাহরীকে নিজের গহনা দান করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে, তিন মেয়ে এবং অসংখ্য দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও পৌত্র-পৌত্রী রেখে গেছেন। তার দুই পৌত্র এবং এক ছেলে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে জামা'তের সেবা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং প্রয়াত সবার মর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)

১ম খুতবার শেষাংশ

এর ফলে আল্লাহ্ তা'লাও আপনার প্রতি অগণিত আশিস ও অনুগ্রহ করবেন।' আর তিনি স্বয়ং এক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন। অন্যদের যেসব উপদেশ দিতেন, নিজের ব্যবহারিক আদর্শও অনুরূপ রাখার চেষ্টা করতেন। কুফে রিডওয়া রিজিওনের হাসপাতালটি হল অঞ্চলের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল; এর রাস্তাঘাট কোন কোন জায়গায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়, এতে রোগীদের অনেক কষ্ট হতো। নিজ খরচে তিনি নতুন করে রাস্তা নির্মাণ করান আর তা উদ্বোধন করার জন্য আঞ্চলিক মন্ত্রী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, ডাক্তার এবং গণমাধ্যমের লোকেরা সবাই এসেছিলেন। সেখানে উপস্থিত প্রায় সবাই অ -আহমদী বা খ্রিস্টান ছিলেন। সেখানে তিনি নিজ অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'আমি একজন আহমদী মুসলমান এবং মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মসীহ্র পুনরাগমন বলে বিশ্বাস করি। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণই আমাকে আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকার প্রদানের নিমিত্তে মানবসেবা করাও শিখিয়েছেন। তাই, (একজন) আহমদী মুসলমান হিসেবে আমি মানুষের প্রতি সহানুভূতি আর তাদের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান করি আর এ কারণেই আমি হাসপাতালের এই সড়ক নির্মাণ করেছি।' আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মোয়াল্লেম জামাল উদ্দীন সাহেবের কাছে পুনরায় পবিত্র কুরআন পড়েন এবং উচ্চারণ শুদ্ধ করার জন্য পুনরায় ইয়াস্সারনাল কুরআন পড়েন। নিয়মিত অনুবাদসহ (কুরআন) তিলাওয়াতের অভ্যাস বজায় রেখেছেন এবং গভীর অভিনিবেশও করতেন। তিনি অনেক শিশুকে দত্তক নিয়েছিলেন, তাদের আবাসনের জন্য নিজের বাড়িতে বাড়তি কক্ষের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন আ র তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন। মোটকথা, তিনি অগণিত সৎকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসূলভ আচরণ করুন, (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার পরিবার-পরিজনকেও তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবতী স্মৃতিচারণ রাবওয়া নিবাসী ফযল দ্বীন সাহেবের ছেলে জনাব গোলাম নবী সাহেবের। তিনি গাবুনের মুরব্বী সিলসিলাহ্ জিয়াউর রহমান তৈয়্যব সাহেবের পিতা ছিলেন। তিনি ২ ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন; ব্যাংকে চাকুরী করতেন, সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর ডাসকায় এসে বসতি স্থাপন। সেখানে তিনি সেক্রেটারী মাল, ভাইস প্রেসিডেন্টও, জেনারেল সেক্রেটারী, আনসারুল্লাহ্র যয়ীমও ছিলেন এবং ইমামুস সালাত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন, কষ্ট করে হলেও মসজিদে এসে নামায আদায় করতেন, নিয়মিত উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অত্যন্ত স্নেহশীল, সহানুভূতিশীল, কোমল-হৃদয়, ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি ছিলেন। যেভাবে আমি বলেছি, তিনি গাবুনের মুরব্বী সিলসিলাহ্ জিয়াউর রহমান তৈয়্যব সাহেবের পিতা ছিলেন; বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তিনি অর্থাৎ মুরব্বী সাহেব পিতার জানাযা ও দাফনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ তা'লা তাকেও ধৈর্য্য ও মনোবল দিন এবং মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)

**********

(১ম পাতার শেষাংশ.....)

নিজের কাজের তুলনায় নিজের সম্মানের পরোয়া না করেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.-হযরত ইউসুফ (আ.)এর ঘটনার উল্লেখ করার নিজের জন্য শেষোক্ত পন্থাটি পছন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন- যতসময় ইউসুফ বন্দীদশায় কাটিয়েছেন, আমি যদি ততটুকু সময় বন্দী থাকতাম, তবে আহ্বানকারীর কথা আমি মেনে নিতাম। (বুখারী ও মুসলিম, আবু হুরাইরাহর পক্ষ থেকে বর্ণিত) মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এ আবু হুরাইরাহ (রা.)-র পক্ষ থেকেই বর্ণিত হয়েছে لَأَسْرَعْتُ الْإِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ অর্থাৎ- আমি অবিলম্বে স্বীকার করে নিতাম। আমাকে প্রথমে অভিযোগ মুক্ত কর -এমন ওজর আপত্তি মোটেই করতাম না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে সক্ষম যে, এই দুটি মর্যাদার মধ্যে সেটিই শ্রেষ্ঠতর যেটি রসুলুল্লাহ্ (সা.) নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। কেননা, যদিও সম্মান রক্ষা করা উচ্চ মর্যাদার কাজ। তথাপি একথা দৃষ্টি রেখে যে, তবলীগের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি হবেনা বা জাতি পর্যায়ের কিম্বা শরীয় বিধান অথবা ধর্মীয় কোন কাজের উদ্দেশ্যে এমন কোন কাজের স্বার্থে কোন ব্যক্তি যদি নিজের সম্মান বিসর্জন দেয় এবং তার উপর থাকা অভিযোগ নিয়ে চিন্তিত না থাকে- নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, যে কিনা, সদুদ্দেশ্যে হলেও, নিজের সম্মান রক্ষার দাবি করে।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)



Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behaif of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir